মানস-সরোবর

# মানস-সরোবর

শ্রীসজনীকান্ত দাস






রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস

মূল্য দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫১

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫—১০. ৫. ৪৪

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

শ্রীচরণকমলেষু

"যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি,
'কে যাবে সাথে ?'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে,
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"

# সূচী

## আমি



## আমরা

আমি

# মানস-সরোবর

সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম ,
সকল দিনের শেষে নাহি নামে রাত্রির আঁধার,
সকল রাত্রির শেষে জাগে না প্রভাত।
দিবসের উদয়াস্ত মানুষের মনের আকাশে,
কালের প্রবাহ চলে ধমনীর শোণিত-প্রবাহে।
লোল চর্ম্ম পক্ক কেশ—এই মহাকালের স্বরূপ—
স্তব্ধ জড় অন্ধকার, হিমে-জমা তমসার স্রোত
গতিহীন তাই শব্দহীন।
নিশ্চল তুষার-স্তূপে বিন্দু বিন্দু বুদ্বুদের মত
লক্ষ লক্ষ যুগান্তের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ
চিরদিন আছে বন্দী হয়ে।
রৌদ্রকরস্পর্শে কভু গলিবে না সে হিম-তুষার,
বন্দী প্রাণ মুক্ত নাহি হবে ,
অনন্ত তিমির-গর্ভে মানুষের অনন্ত বিশ্রাম।
এই মৃত্যু, এই পরিণাম।
সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম।

ক্লান্ত পক্ষ বিস্তারিয়া, রাজহংস পঁহুছিল শেষে
হিমাচল-পাদমূলে গাঢ়নীল মানসের তীরে।
হিমাচল—ধরণীর চিরন্তন অন্ধ সংস্কার,
যুগান্তের জড়ত্ব বিপুল।
তারই মাঝখানে রচা মানুষের কল্পনার চরম আশ্রয়
সুখস্বর্গ মানস-সাগর।
মনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাই তো মানস-সরোবর।
ভগ্নপক্ষ রাজহংস পঁহুছিল মানসের তীরে।

মানস-সাগর—
সেখানে নীলের মাঝে জীবনের পরম ইঙ্গিত।
অসংখ্য উপলখণ্ড তীরে তীরে যায় গড়াগড়ি,
পায়ে পায়ে মৃতকল্প জীবনের উঠিছে ঝঙ্কার।
ধরণীর রাজহংস নভচারী হংস-বলাকায়
আসিছে মানস-তীর্থে অবিশ্রাম ডানা ঝাপটিয়া,
দীর্ঘ পথ পার হয়ে হেথা তার সুদীর্ঘ বিশ্রাম।

আমারো বিশ্রাম জানি এই নীল মানসের তীরে,
যে মানস আমারই মানসে ;
মোর হিমাচল-মূলে স্তব্ধ শান্ত নীলাম্বু-সায়র—
আমি রচিয়াছি সেথা ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের অন্তিম বিশ্রাম,
আপনি করেছি সৃষ্টি টলমল নীল নীর স্বচ্ছ সুশীতল,
অগাধ অতল জল, মোর তপ্ত জীবনের জ্বালা-অবসান।

পাখী এল কুলায়ে আপন,
নামিছে অনন্ত রাত্রি আলো-জ্বলা ছাইয়া আকাশ,
নামিছে অনন্ত অন্ধকার।
দেখিতে পাই না চোখে ভগ্ন জীর্ণ আপনার পাখা,
শুনিতে না পাই কানে দিবারৌদ্র-ক্ষুধাতুর শাবকের ব্যাকুল
কাকলী।
বহুদূর নদীতীরে সায়াহ্নের শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে বিদীর্ণ মন্দিরে,
দেবতার শেষ পূজা হ'ল সমাপন —
বাতাসে তরল হয়ে তারই রেশ পশিতেছে কানে।
প্রান্তরে প্রাঙ্গণে কোথা তুলসীর বেদীমূলে সন্ধ্যাদীপ হইয়াছে
জ্বালা,
মানসের অন্ধকারে তারি দীপ্তি সারি সারি জ্বলিতেছে খদ্যোত-
শোভায়।

রাজহংস, করিও না ভয়।
অদূরে কৈলাস-চূড়ে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ হানিতেছে বাঞ্ছিত চুম্বন
তোমার সকল আশা, যুগান্ত কামনা তব শোভিতেছে বিস্তীর্ণ
সুন্দর,
তুষার-স্ফটিক-দীপ্তি হাসিতেছে অন্ধকারে মৃত্যু-ম্লান হাসি।
রাজহংস, করিও না ভয় —
দীর্ঘ পথ হ'ল শেষ, হের কাঁপিতেছে ওই—
কাঁপিতেছে মনোহর নীল-অম্বু মানস-সাগর।

কার্ত্তিক, ১৩৪৮

# আমি

প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি বারতা,
মাটির আঁধার হতে বিষ-বাষ্প দিয়াছে উত্তর।
মোর শান্ত মুহূর্তের অন্তরের সহজ কামনা—
উদার পরিধি আর অনন্ত বিস্তার,
আলোকের প্রসার বিপুল—
উত্তেজিত মুহূর্তের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চক্রব্যূহে
কুণ্ডলিত সর্পসম পাকে পাকে জড়ায়ে জড়ায়ে
ফুঁসিয়াছে জীর্ণ ক্ষুদ্র আপন বিবরে,
বৃহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা,
অভ্রচুম্বী চূড়া মোর নিমেষে করেছে ধূলিসাৎ।
কে আমি, কি মোর পরিচয়—
এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি পাসরি
ভালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,

কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ, রস, রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব ;
সত্তা পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল, হবে না প্রকাশ
কোন দিন।

জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহত্ত্বের বৃহত্ত্বের প্রতিদিন করিব স্বীকার।
দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, ভুল-ভ্রান্তি স্খলন-পতন—
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিত,
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার ঝরে অশ্রুজল
সমস্ত ক্ষুদ্রতা-ক্ষোভ অসহ্য যন্ত্রণা-দুঃখ মাঝে,
প্রতিদিবসের অতি ব্যর্থ শূন্য নিরর্থক কাজে—
মাথার উপরে স্থির স্তব্ধ শূন্য অনন্ত আকাশ,
দীর্ঘ বনস্পতি-শিরে নবশ্যাম কচি কিশলয়,
নামহীন পাখীদের গান,
নিভৃত অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে গেয়ে-ওঠা বঞ্চিতের
অসম্পূর্ণ গান,
হঠাৎ কাঁপিয়া-জাগা সুর,
হঠাৎ ভাঙিয়া-পড়া বন্ধুদের প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রচুর।
নিজে বেশ ভাল আছি, অকস্মাৎ বুঝিয়া বিস্ময়ে
নিপীড়িত দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে দুই চক্ষে ছলছল জল—

যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যত আমি ব্যর্থ হই, বৃহতে বিরাটে
নমস্কার,
নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো নমো নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।

ঊর্দ্ধে শূন্য নীলাকাশ,
বারম্বার তবু ভুল হয়—
ঘরের কপাট রুধি, বাহিরের রুধিয়া বাতাস,
আপনার বিষ-বাষ্পে আচম্বিতে হাঁপাইয়া উঠি;
মর্ম্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,
রূঢ় কহি প্রিয় বন্ধুজনে—
বিকৃত বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
আপনি শিহরি উঠি নিজেরে প্রত্যক্ষ করি মনের মুকুরে।

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,
মোর মূর্ত্তি সত্য এ তো নহে—
সে তো নহি আমি।
পীড়িতের ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে একা জাগি আমি,
একা গাহি গান—
কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—
অর্থ তার গুপ্ত রহে সুর আর ছন্দের আঁধারে,
আমি—মোর নামের আড়ালে;

নাম সে মরিয়া যাবে, উদার নিঃসীম শূন্যে আমি তবু
রহিব জাগিয়া।

বন্ধু, শোন তোমাদেরে বলি
অনন্ত আমার এই চোখে-দেখা খণ্ড ইতিহাস,
যতটুকু আমি তার জানি—
আকাশে খসিছে তারা, নদীতটে ভেঙে পড়ে ঢেউ,
ছায়া কভু পড়ে নাকো শুভ্র স্বচ্ছ আকাশের নীলে,
দাগ কভু পড়ে নাই টলমল বারিধির বুকে।
সে বিরাট শূন্যতায় আমি পরিচয় হীন তোমাদের কাছে।
তোমরাও নহ প্রয়োজন
সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর

শূন্যতায় রৌদ্র করে মায়ার সৃজন,
রূপে রঙে তাহার বিকাশ—
মানুষেরে রঙ দেয় রূপ দেয় শুধু ভালবাসা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে একমাত্র মায়া-যাদুকর
আমি ভালবাসার কাঙাল-
আমারে ডাকিয়া কাছে আমারে নির্মাণ করি লও
ক্ষণিকের আলোক-সম্পাতে,
তোমাদের প্রেমের আলোকে।
দেহহীন মানুষেরা নিরালম্ব ভাসিছে অসীমে,
পরস্পর-পরিচয়-হীন—
যার যত ভালবাসা তার কাছে ততই প্রকাশ।

বিশ্ব তার ভ'রে ওঠে রূপের গৌরবে,
প্রেমের রহস্যে ঘেরা এ বিশ্বের পরিধি বিপুল—
আমারে তোমরা দাও প্রেম,
রূপ দাও, দেহ দাও মোরে।

সমস্ত বেদনা-বিষ এ জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে ;
মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের আব কোনো
নাহি পবিচয।

পৌষ, ১৩৭৩

# স্লেটের লেখা

মনের খেয়ালে একদিন আমি তুলিয়াছিলাম ছবি—
মনের ক্ষুধার অসংখ্য ফোটোগ্রাফ,
ছাড়া ছাড়া সব যতনে ফেলায় ফেলা।—
সবারে মিলায়ে মালা গাঁথিবার ছিল না সূত্রখানি,
আমি ছিনু ছেঁড়া-ছেঁড়া
কখনো শহরে, কভু অরণ্যে, কখনো গাঁয়ের হাটে,
ছলছল-জল কখনো নদীর তীরে,
উপলমুখর ঝরনার কূলে কূলে,
রুক্ষ গিরির শিখরে সঙ্গীহীন,
সহসা-শৈলবিদারী প্রপাত উথলে,
কখনো একার কখনো উহার সাথে—
পশ্চাতে কভু মেঘমায়া-ঘেরা গম্ভীর পটভূমি,
কখনো শ্যামল অরণ্য-সমারোহ।
আকাশে ছড়ানো নক্ষত্রের মত
ছাড়া ছাড়া তবু রাশিচক্রের মূর্তি রচনা করি
জড়াইয়া তারা ছিল যে পরস্পর।

গগন-ললাটে গেঁথে তুলিবার ছিল নাকো বন্ধন,
মনের আকাশে আজিও তাহারা তেমনি ছড়ানো আছে।

মনের আবেগে একদিন আমি আঁকিয়াছিলাম ছবি—
বর্ণে বর্ণে অপরূপ সেই পুরাতন ছবিখানি
দেয়ালে কখন রেখেছি টাঙায়ে সে তোলা-ছবির দলে,
তেমনি করিয়া কাচ-আবরণে কাঠের ফ্রেমেতে বাঁধি
কবে যে রেখেছি কবে যে ভুলিয়া গেছি—
হাতে-আঁকা ছবি এক হয়ে কবে মিশিয়াছে ফোটোগ্রাফে।
আনমনে কত অভ্যাসবশে ধূলা ঝাড়িবার ছলে
সমান আদর করিয়াছি দুই বেলা।
কখনো দেখি নি কাঁদিয়াছে ছবি বর্ণের অভিমানে,
ছিঁড়িয়া পড়েছে ভুঁয়ে
যে আবেগ আর যে বেদনা যেই বেদনা-মথিত সুখ,
আমার মনের নিভৃত কোণের যে শঙ্কা-শিহরণ
বর্ণে বর্ণে ছবির আকারে একদা ধরেছে রূপ,
সহসা কখন হারাইয়া গেছে রূপহারাদের দলে।
ভাবিতেছি বিস্ময়ে,
মনের আবেগ ছবির আকারে অগ্নি-গিরির বেগে
আঁধার আকাশে আবার কখনো হবে কি উৎসারিত?

মনের খেয়ালে একদিন আমি কেবল কয়েছি কথা—
কথার উপরে কথা সে যেন রে তুবড়ি ফোটায় ফুল—

বাঁচিতে বসিয়া মরিতে চাওয়ার কথা,
মরিতে বসিয়া কাঁদিয়া ভাসানো গাল—
বাঁচা আর মরা, মরা আর কাঁদা—সকল খেলার শেষে
দ্বিগুণ সোহাগে বুকেতে চাপিয়া ধরা
কাচের গেলাস ভেঙে করে ঝনঝন,
তরী ডুবে যায় নীরব স্রোতেতে তলহীন বারিধির
ঘুড়ি আর পাখী সমানে আকাশে ওড়ে—
ঘুড়ির লাটাই সুতার বাঁধনে অবিরাম কহে কথা,
পাখীর পাখায় নাই শিকলের ভয়
কথা আর কথা, কেবলই কথার মালা —
"তোমার পরশে জীবন-সাগরে জেগেছে জোয়ার মম,
হয়েছি উদ্বেল,
আরো কাছে এস, দূর আকাশের পাখী।"
কথা কই আর আমি নিজে কাছে যাই।
কথা-কওয়া-ফুল এমনি ফুটেছে কত—
মূক-হওয়া মুখ মুখর হয়েছে পুন—
মরণোন্মুখ মানবের মুখে কথা ফোটে অবিরল,
সকল বলার তবু হয় নাকো শেষ,
বুকেতে আমার হাহাকার করে আজও অকথিত কথা।

মনের আবেগে একদিন আমি গাহিয়াছিলাম গান—
কথাহীন শুধু একটি মাত্র সুর—
তার রেশ আজ পাই না খুঁজিয়া মোর ভোলা ত্রিভুবনে
—কলকোলাহল-স্পন্দিত ত্রিভুবন ;

তরঙ্গ তার জানি তবু দোলে নভোনীলিমার পারে
ধরার বাতাস শূন্যে যেথায় লীন,
সেথা হতে পুন ফিরিয়া ডাকিতে তারে
ব্যাকুল পাখায় ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হয়েছে মন,
পায় নি নাগাল তার।
ছিন্নপক্ষ ভূমে পড়িয়াছে—ধরার তৃষিত ধূলি
নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়া তাহারে কহিয়াছে কানে কানে—
"ক্ষণিকের গান, আমি যে চিরন্তন,
আমার বুকেতে ফলাবে ফসল তোমার কামনা-বীজ,
মৃত্তিকা ফুঁড়ে আলোর আকাশে প্রথম তুলিবে শির,
অপরূপ সুর তাহার বিফল মাঝে,
তার সেই সুরে গান গাবে চরাচর।
ক্লান্ত পথিক, শুন গো পাতিয়া কান
হারানো তোমার গান যে বেসুর জমানো গানের কাছে
ভুলিয়া গিয়াছি কবে গাহিয়াছি গান—
মাটির আধারে পেতেছি শুনিতে মাটি ফাটিবার সুর।

মনের খেয়ালে একদিন আমি বাসিয়াছিলাম ভাল।
এই ধরণীর রূপ রঙ হাসি গান
মোর দেহহীন প্রেমের দিয়েছে রূপ—
রূপ সে তখনি ফেটে ফেটে গেছে ফেন-বুদ্বুদ সম।
দেহ জাগে আর দেহ কাঁদে হাহাকারে,
ভালবাসা কোথা প'ড়ে থাকে পিছে দেহ চলে আগে আগে

এমনি কত যে ঘটিয়াছে বার বার—
প্রেম-শিখা কত নিবিতে নিবিতে মাংসের ফুৎকারে
জয়ী হয়ে শেষে র'য়ে গেল অচপল ,
রূপ হতে রূপে, দেহ হতে তার গতি যে দেহান্তরে,
খর উজ্জ্বল কখনো স্নিগ্ধ ম্লান,
জ্বলেছে কত যে বিভিন্ন স্নেহে আলো তার তবু এক।
চলচঞ্চল এ জগৎ মাঝে একা আমি পূবা নই,
বৃহৎ বিরাট কঠিন তবুও নিতান্ত অসহায়।
অক্টোপাসের বাহু—বাহু নয়, অসহায় কামনা যে—
যাহা আসে কাছে আঁকড়ি ধরিতে চাহে সে ব্যাকুল বলে।
মোর ভালবাসা শিশুকাল হতে ফিরেছে দোসর খুঁজে—
কখনো ভিক্ষা কভু কাতরতা কখনো পরাক্রম।
আজ সে বিবাগী, তবু
অজানা অনাম অনিশ্চিতের খুঁজিতেছে আশ্রয়।

মনের আবেগে একদিন আমি চলিয়াছিলাম পথ—
ভাবিয়াছিলাম পৌঁছিব পথশেষে।
পথের বিকারে পথ চলিয়াছি, পথ সে বিসর্পিত—
চক্রবালের সীমা শেষ তবু পথের চিহ্ন আঁকা,
চলার নাহিক শেষ।
অপরিচয়ের লভি পরিচয়, পরিচিতে যাই ভুলি—
পরম আদরে কভু ডাকিয়াছে দূরের পাহাড় বন,
উদার আকাশ নীলের অতলে প্রাণে জাগায়াছে আশা—
মেঘেতে মেদুর কখনো নয়নে দিয়াছে নীলাঞ্জন,

ভয় দেখায়েছে ভ্রূকুটি-কুটিল তড়িৎ-বহ্নি কভু,
ধূলিকঙ্কর কর্দম কভু হয়েছে নয়নজলে,
ফুল হয়ে কত ফুটিয়াছে কাঁটা, কাঁটা হইয়াছে ফুল,
কত যে শ্মশান এ পথে হয়েছি পার,
কত জনপদ, ধূম্রমলিন চপল নগরী কত,
মৃত্যুর কোলে ঘুমন্ত কত গ্রাম,
চলেছি দেখেছি থামিয়াছি ভুলে বসেছি অন্যমনে,
তারকাখচিত আকাশের তলে বসিয়া শিহরি শুনি—
আলো-ইঙ্গিতে ডাক দিয়া মোরে বলিতেছে ছায়াপথ—
"ক্লান্ত পথিক, ওঠ, জাগো, আজো শ্রেয়কে হয় নি জানা
প্রেয় সে হারাল, আজো সে শ্রেয়ের হইল না সন্ধান।

শ্রান্ত ক্লান্ত বসিয়াছি আজ শীর্ণ পথের ধারে
স্তিমিত তপন ধীরে ধীরে ডুবে যায়।
অরণ্যশিরে হেরি ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিছে ক্লান্ত পাখী,
শুনিতেছি কানে তাহাদের কলগীতি।
বিহগের গানে রঙ-ধরা মেঘে জুড়ায় তপ্ত মন,
ক্লান্ত পাখায় বহি আনে তারা রাত্রির আশ্বাস—
যে রাত্রি বিশ্রাম।
দিবসের গ্লানি মুছিয়া লইতে মায়ের আঁচল সম
ধীরে ধীরে ধীরে নামিছে অন্ধকার ;
নামিছে সমুখে নামিছে পিছনে মম—
তোলা-ছবি আর আঁকা-ছবি মোর, সারা জীবনের কথা,
কিশোর-কালের হারানো গানের সুর,

অতি দুর্দ্দম যৌবন-ভালবাসা,
হাজার শাখায় বিভক্ত মোর একটি চলার পথ,
বালক-কালের সেলেটের লেখা, ভুল সে আখরগুলি
মুছে দেবে কাল—তারই চলে আয়োজন ,
এ আঁধার তারই মুখনিঃসৃত বাষ্পের ফুৎকার।
সেই ফুৎকার লাগিছে আমার গায়ে,
ঝাপসা হইয়া আসিতেছে চারিদিক -
জননী কোথায় গাহিছেন বসি ঘুমপাড়ানিয়া গান,
জড়াইয়া ধীরে আসিছে আঁখির পাতা
সারা জীবনের স্বপ্ন আমার, সারা জীবনের কাজ
লেপিয়া মুছিয়া হইতেছে একাকার।
তন্দ্রার মাঝে এইটুকু শুধু রহিয়াছে আশ্বাস,
অতি অস্ফুট শিশুর সে অনুভূতি—
শিয়রে জননী আছেন বসিয়া, তাঁরই কোলে মোর মাথা।

বৈশাখ, ১৩৪৬

# স্মৃতি

তিমিররাত্রি প্রভাত হইল শ্রাবণের শর্বরী,
জাগিয়া বসিনু ব্যাকুল প্রতীক্ষায়—
ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে ছিন্ন আমার ফুলের বনে
ফুটেছে কখন রজনীগন্ধা একটি শুভ্রশুচি।
আমার মনের গোপন বাসনা নিশীথ-অন্ধকারে
ঝঞ্ঝা-আঘাত-ক্লিষ্ট কঠোর নিদারুণ সাধনায়
ধীরে ধীরে ত্যজি বিকারের বিভীষিকা,
তপস্যাশেষে কখন লভিল দেবতার কৃপাকণা—
উঠিল ফুটিয়া একটি কুসুমরূপে।
বিস্ময়ে জাগি তিমিররাত্রি-শেষে
ফুলের গরবে নিজেরে ধন্য মানি।

প্রভাত তখনো স্বর্ণবরণ, নভে বালারুণ রবি
মেদুর মেঘের আড়ালে কিরণ হানে ;
কাননে আমার কামনার ফুল দোলে বায়ু-হিল্লোলে—

মুগ্ধ ছিলাম শিশু-চপলতা হেরি।
সহসা কখন আকাশ ব্যাপিয়া ঘনাল প্রাবৃট্-মেঘ,
অকালসন্ধ্যা নামিল আমার বনে।
ঝড় ছুটে এল অন্ধ আবেগে উড়াইয়া এলোচুল
বিদ্যুৎ-ফণা বিস্তারি চৌদিকে।
কোরক-কুসুম মম
বজ্র-আঘাতে ছিন্নভিন্ন খসিয়া পড়িল ভূমে।
মূর্চ্ছাভঙ্গে নয়ন মেলিয়া শান্ত দ্বিপ্রহরে
অনুভব হ'ল, আপনি দেবতা নামি ফুলবনে মম
আপনি চয়ন করিয়া গেছেন আপন পূজার ফুল।

আমার ক্ষুদ্র কুসুমের বনে আরো ফুটিয়াছে ফুল,
বায়ু-তরঙ্গে দুলিছে বৃন্ত 'পরে,
শারদ আকাশে মেঘ ভেসে ভেসে যায়,
নীলের অগাধে ঘুরে ঘুরে ওড়ে নামহীন কত পাখী।
অলস-শয়নে নয়ন মেলিয়া দূরে পাঠাইয়া আঁখি
মন শুধু চায় তুলিয়া ধরিতে রহস্য-যবনিকা—
জীবনে ঢাকিয়া জীবনাতীতের ইঙ্গিতভরা
নিবিড় সে আবরণ,
পরপারে তার লুকাইয়া আছে হাজারো যুগান্তের
পলাতকাদের যত কিছু সন্ধান।
নীল যবনিকা তুলেছে কি কেউ, প্রাণমৃত্যুর
ছিঁড়িয়াছে ব্যবধান,

এপারে বসিয়া ওপারের ভাষা চকিতে কখনো
নিজে করি অনুভব
আশ্বাসবাণী শুনায়েছে মানুষেরে ?

মনে পড়িতেছে, ঋষির তনয় বালক সে নচিকেতা
মৃত্যুর গৃহে আতিথ্য যাচি স্বয়ং যমের মুখে
লভিয়াছিলেন মৃত্যু-বিজয়ী অমৃতের পরিচয়।
প্রাচীন তত্ত্ব, শ্লোকে শ্লোকে তার মহৎজনের
সুবৃহৎ সান্ত্বনা।

আমার ক্ষুদ্র শোক খুঁজে মরে অজানা আঁধারে
হারানো বুকের ধন,
ব্যাকুল হস্তে যদি বা চকিতে লাগে পরিচিত ছোঁয়া,
পশে যদি কানে অস্ফুট আধ-ভাষা।
জানি শুনিব না, জানি জানি মোর ছিন্ন ফুলের স্মৃতি
বর্ত্তমানের ভবিষ্যতের অসংখ্য ফুল মাঝে
অক্ষয় হয়ে বাজিবে বক্ষে অলস দ্বিপ্রহরে।
সেই সান্ত্বনা, মর-জীবনের সুগভীর আশ্বাস—
কাঁটার ব্যথায় জাগ্রত রয় কুসুমের ইতিহাস।

বিরহব্যাকুল অশ্রু-অন্ধ ব্যথাতুর মানবেরা
যুগ যুগ ধরি সৃষ্টির সেই অনাদি প্রভাত হতে
স্বর্গে চাহিয়া চেয়েছে ভুলিতে মর্ত্ত্যের বিভীষিকা।
প্রিয়-প্রিয়তর-প্রিয়তরজনে পথের প্রান্তে ফেলি



সম্মুখ পানে অবিরাম চলা মুছি নয়নের জল,
বক্ষে বহিয়া বেদনা-স্মৃতির অসহ কঠিন ভার।
ট্র্যাজেডি-কমেডি সমান এ অভিনয়ে
জীবন-নাট্যে যতদিন নাহি পড়িতেছে যবনিকা।
করতালি দেয় স্বর্গের দেবতারা,
শুনিতে না পাই, শুনিবার লোভে ঊর্ধ্বে চাহিয়া থাকি।

চেয়ে চেয়ে চেয়ে অসীম শূন্যে আঁখি পরাজয় মানে,
ফিরে ফিরে আসে মর্ত্যের ধরণীতে—
যে মাটি মোদের একান্ত আশ্রয়।

চৈত্র, ১৩৪৫

## পত্র

[ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ]

আশ্বাস ছিল প্রাণ ছিল যতখন ;
ধুকধুক-করা কচি বুকে ছিল মোর কবিতার প্রাণ।
থেমেছে যন্ত্র, কবিতা, বন্ধু, ঠেকিবে অর্থহীন,
অবোধ মনের অবাধ কথার মালা ,
কবিতা লিখিয়া মনেতে লজ্জা মানি।
কেহ নাই জেগে, পৃথিবী ঘুমায়, ঘুমাইবে চিরকাল,
জেগে আছে শুধু নামধামহীন অন্ধ আতুর ক্ষুধা—
মহাকাল-বুকে মহাকালী যার নাম।
জীবন-নদীতে মৃত্যুর চোরাবালি—
ঘোরে অবিরাম, টানিতেছে নীচে আবর্ত্ত ভয়াবহ,
ভেসে থাকে যারা দেখে বিস্ময়ে একটি দুইটি করি
পথের সঙ্গী মিলায় ঘূর্ণিজলে।
অসহায় শিশু সেও ডুবে যায়, শুধু দুটি কচি হাত
জাগিয়া শূন্যে নিমেষে মিলায় শেষ নির্ভর খুঁজি ;
চেয়ে চেয়ে দেখি, ভাসি কালস্রোতোজলে—
অনন্ত মহামৃত্যুর মাঝে জীবন ক্ষণবিকার।

তুমি তো বন্ধু, জীবনে দেখেছ সব ক্ষতি ক্ষোভ মাঝে,
মরণে দেখেছ মুক্তি অথবা মহাবিভীষিকা রূপে।
দেখেছ লিখেছ সহৃদয় প্রেমে নর-বুদ্‌বুদ-কথা,
কেন তারা জাগে, কেন রঙ ধরে, বুদ্‌বুদ আবরণ
হর্ষে ব্যথায় কেমনে ফাটিয়া যায়।

আমিও বন্ধু, স্রোতে ভাসিতেছি—এইটুকু পরিচয়,
সংগ্রহ করি যতটুকু দেখি বুদ্‌বুদ-ইতিহাস—
মুখে যাই থাক, বুকেতে আমার নাই সান্ত্বনা-ভাষা।
কারেও ভাসায়ে কারে আবর্তে টানি
মহাকাল-পথে চালান যে জন তাঁহারে নমস্কার।

আশ্বিন, ১৩৪৫

# রাত্রি

রাত্রি আসিল তারপর।
দিনের আলোক ছেয়ে নামিল রাত্রির অন্ধকার,
আকাশে ফুটিল তারা, তারা সংখ্যাহীন।
ধরণীর অন্ধকারে মানুষের ঘরে
জ্বলি উঠে সারি সারি অসংখ্য প্রদীপ।
বহে স্নিগ্ধ বায়ু, তবু ভয় জাগে মনে—
আসিল অজানা অন্ধকার।

আলোতে ছিলাম ভাল, দক্ষিণে ও বামে
ঊর্ধ্বে অধঃ সম্মুখে পশ্চাতে
দৃষ্টির নির্ভর ছিল সত্যবস্তুজালে;
সুন্দর কুৎসিত বীভৎস বা মনোহর যাই হোক—
আলোক-মাধ্যমে
ছিল না সংশয় কোনো চোখের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে।
গ্রহণ বা পরিহার আলোকে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন,

ছলনা করে না রৌদ্রে কল্পনা-আশ্রিত অনুভূতি,
দর্শনে দেয় না ফাঁকি বিজ্ঞানের নিরেট বিশ্বাসে।
আলোকের বাস্তব সহায়ে
ক্ষুধা—খাদ্য, প্রেম—স্পর্শ হিসাবের অধীন সকলি ;
বঞ্চনা বা অপচয় যুক্ত রহে খেয়ালের সাথে।
তিক্তেরে সুমিষ্ট ভাবি দিনে জিহ্বা-জড়তা না কাটে,
আগুলফলম্বিত চুল ফণিমালা হয়ে
কণ্ঠে বক্ষে জড়াবার অবকাশ রৌদ্রে নাহি লভে।

দিনের উজ্জ্বল পরিচয়,
দিবসের সুস্পষ্ট ভাষণ
ছাদেতে চ'টাই পাতা, শুকাইছে ব'ড়ি,
কাসুন্দি প্রস্তুত হয় কাচের বোতলে,
তাঁজে তাঁজে রৌদ্র লেগে শীতবস্ত্র হয় পোকাছুট।
মাঝে মাঝে মেঘ আসে—ছায়ার সঞ্চার,
আসে পথক্লান্ত পথিকের
ঘর্মাক্ত শরীরে ক্ষণ-শীতলবিরাম
দিবসের প্রখর যুক্তিতে
ধূলিরে ধূলিই মানি, কণ্টকে কণ্টক।

রাত্রি এল অন্ধকার,
এল স্বপ্ন, এল জ্যোৎস্না, এল মায়াজাল
নিদ্রাহারা আতুরের করাঙ্গুল আবর্তিত হয়
অতি-দীর্ঘ নিশীথের জয়মন্ত্র-জপে।

অতি পরিচিত স্পর্শ অকস্মাৎ ভয়রূপ ধরে ;
অঙ্গুলির অন্তরাল অন্ধকারে যোজন বিস্তার।
আকাশের তারা দেখি, কোটি কোটি তারা,
তিমির-আবৃত শূন্য পরিমাণহীন—
স্তরে স্তরে গগনে গগনে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে আতঙ্কিত রহস্য ঘনায়।
দেখিতে দেখিতে
বিরাট বিপুল আমি হ'য়ে প'ড়ি অকিঞ্চিৎকর,
জীবনের মূল্য ক'মে যায়।
নীল বারিধির তীরে রাশি রাশি সমুদ্র বালির,
তার মাঝে চির-আত্মহারা
একক বালির সত্তা অন্ধকারে করে আর্তনাদ।
মরণের গাঢ়তর তিমিরের মাঝে
বালুকণা লুপ্তি খোঁজে চরম লজ্জায়।
সূর্য্যকর বিচ্ছুরিয়া দিনের আলোকে
যে বালুকা শূন্যে ধরে জ্যোতির্ময় রূপ,
অসংখ্য জনতা মাঝে অনুভূতি জাগে যার আপন
নিঃসঙ্গ মহিমার—
অসহায় রাত্রির আঁধারে
দিশাহারা সেই বালু স্বেচ্ছামৃত্যু খোঁজে।

সৃষ্টির আদিমতম রহস্য বিপুল
দিবসের অন্ধকারে লুক্কায়িত রয়

রজনীর আবরণে শোভা পায় সম্পূর্ণ প্রকাশে।
তুষার-শীতল যুগ, জীবধাত্রী জননী মোদের
তখনো একান্ত মনে যাপিতেছে কুমারী-জীবন—
নিষ্পাপ জীবন।
তারো পরে রহস্য পরম—
একান্ত কামনা হতে কুমারীর গর্ভের সঞ্চার,
জরাগ্রস্ত উদ্ভিদের প্রাণ,
সকল প্রাণীর জন্ম, কোটি বর্ষ পার হয়ে যায়,
অন্ধকারে রূপ ধরে মানুষের পূর্ব-ইতিহাস।
পলাতক অতীতের সনে
আমি বাঁধা পড়ে যাই রজনীর গাঢ় অন্ধকারে,
ভয় পাই আমি।

দিনের নাস্তিক ভবিষ্যৎ,
নাস্তিক অতীত, দিন নিত্য-বর্তমান।
ভবিষ্যৎ ধরে রূপ রাত্রির আঁধারে,
রূপভাঙা অতীতের সাথে
এক হয়, এক সূত্রে পড়ে যায় বাঁধা।
রাত্রির ছায়ান্ধকারে আমরা দেখিতে শুধু পাই
মানুষ দেবত্ব লভি নিষ্কলুষে করে বিচরণ
চির-আলোকিত স্বর্গে, ছায়া নাই — যথা শুধু আলো,
কথা কয় অতিমানবেরা।

# এই যুগ

এ যুগের কথা কহিবে সে কোন কবি,
এ যুগের কথা কয়জন বল জানে ?
বিদেশী কেতাবী বুকনি প্রয়োগে অতীব 'ক্লেভার' যারা,
তাহারা কহিতে চাহিছে যুগের ভাষা।
কাগজের 'বেডে' ফোটে কাগজের ফুল —
কাগজের ফুলে রঙ শুধু আছে, নাহিক মাটির ভাষা—
রঙ সে নামিয়া আসে না আকাশ হতে,
ড্রয়িং রুমের ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত সেই রঙ যে চমৎকার।
যুগমানবের ঠেকিয়েছে ঘোর-ঘোর,
যাহা নয় তারা তাহাই সাজিয়া বসিছে রঙের মোহে।

এ যুগের গান গাহিবে সে কোন কবি ?
যুগ সে নূতন, নূতন মানব, প্রাণ সে চিরন্তন,
ধ্বনিয়া তুলিবে নব-মানবের পুরাতন সেই প্রাণে
লক্ষ যুগের শত অলক্ষ্য সুর,
এ যুগের গান গাহিতে কে বল জানে ?

লাঞ্ছিত হয় সুর প্রতিদিন সুরের বিকৃতি মাঝে,
কান্না ফুটিয়া উঠিতেছে তাই অট্টহাসির রোলে,
কান্নার মাঝে শুনি খলখল হাসি।

এ যুগের ভাষা আজো কেহ বলিল না—
অনাদি অসীম ভাষার বারিধি, কল্লোল তার কানে নাহি
যায় শোনা।
এ যুগের ভাষা তটে-লেগে-ভাঙা ঢেউয়ের মাথায়
ফেন-বুদ্বুদ যেন,
নিমেষে জাগিয়া নিমেষে মিলায়ে যায়,
কাল-বারিধির খরবালুতটে এ যুগভাষার রবে না চিহ্ন
কোনো,
এ যুগের কবি আজিও ভাষায় লেখে নি মনের কথা।

যুগগৌরবে গর্ব্বিত যারা, যুগের কবির খ্যাতিলোভ
যাহাদের,
তাহারা কহিছে যুগের নকল ভাষা—
শুধু মনগড়া অভিনব ভঙ্গীতে,
দম্ভের ভঙ্গীতে।
বনের আঁধারে অগভীর ডোবা, সলিলে তাহার নাহি
অতলের ভাষা,
পচা পাতা আর পঙ্কবাষ্পে জাগাইছে তারা অবিরাম
কোলাহল;



নগরীর পথে জাগিয়া যেমন আছে চিরদিন হতভাগা
উন্মাদ
উলঙ্গতার উল্লাস ল'য়ে দৃষ্টি সবার করিতেছে অধিকার।
তেমনি যুগের নকল কবিরা সবে
শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তে নিত্য করিতেছে উপহাস
সুন্দরে বলিছে প্রাচীন মনের ভুল,
হিমালয় হতে বড় বলি মানে কর্দমের কুয়াশায়
বুক যা বলুক, মুখে বলিতেছে শুধু বিপরীত বুলি,
বিকৃত রুচির বীভৎস চীৎকার।

এ যুগের বাণী নহে নয় তাঁহাদের
মিথ্যার মোহে তারা যা জেনেছে যুগের সত্য কভু তাহা
নয় নয়।
বিকৃত ক্ষুধার আধুনিক ফাঁদে কভু কাঁদে নাই পুরাতন
ভগবান,
মানুষের রূপ কভু শুধু না কাম-কামনার রূপ

এ যুগের কথা কবে কে যুগন্ধর—
যুগের ধর্ম্ম কোন্ তপস্বী জানে?
কলযুগ যে যুগে প্রবল প্রতাপে ধর্ম্মের নামে খেলিছে
চরম খেলা,
তুলেছে কি কেউ যুগ-মঞ্চের রহস্য-যবনিকা?
হৃদয় মেলিয়া দেখেছে কি কেউ পিছনে তাহার চলিছে যে
অভিনয়—

আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি ও অশ্রু আনন্দ-বেদনার !
প্রাচুর্য্য মাঝে ক্ষুধিত ভোগের বিলাসক্লিষ্ট রূপ,
পীড়িত ব্যথিত অন্নহীনের অসহায় হাহাকার,
শিশুর কাকলী, জরার মরণশ্বাস,
জীবনমৃত্যু ফেলিছে চরণ পাশাপাশি গলাগলি।
সবারে ছাড়ায়ে নর-মানবের গগনস্পর্শী বিপুল জয়ধ্বনি
শুনিয়া শিহরি সভয়ে সে কোন্ কবি
মরিয়া-অমর যুগ-মানবের রচিয়াছে বন্দনা ?

মহাযুদ্ধের শেল-শক আর মারণ-বাষ্পে জন্ম লভিল যারা,
ধরার-মাটির-প্রথম-পরশ-কান্না যাদের ডুবেছে মেশিন-গানে,
এবং যাহারা ঘুমাইয়া ছিল সন্তাপক্লেশ বিলাস-ব্যসন মাঝে,
সে ঘুম যাদের ট্রেঞ্চ-শয্যায় তিমিররাত্রে ভেঙেছে
আচম্বিতে,
এবং যাহারা গৃহে অনশনে প্রতিদিন পেল প্রিয়-বিয়োগের
ব্যথা,
ছিন্নহস্ত ভগ্নচরণ জাগিল যাহারা হস্‌পিটালের 'বেডে',
রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় আজো বহে যারা মৃত্যুর
যন্ত্রণা,—
উত্তেজনায় উন্মাদ হ'ল যারা,
মৃত্যু যাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিয়া গিয়াছে, হে বন্ধু,
আমি আছি,
মৃত্যুর ভয়ে জীবনে লইয়া ছিনিমিনি খেলা যারা খেলে
সুতরাং—

আমরা তাহারা নহি—সেই কথা এ যুগের কবি স্মরণে
কি রাখিয়াছে !
মোদেরে পিষিয়া চাহে না মারিতে ওদের ঘরের শত
সমস্যাভারে।

আমরা তাহারা নহি।
তাহাদের ঢেউ আকাশ-সাগর ডিঙায়ে যদিও লেগেছে
মোদের গায়ে—
ড্রইং-রুমের টেবিলে মোদের চা-এর পেয়ালায় তরঙ্গ
তুলিযাছে
চমকে চমকে কথায় কথায় মোরা কয়জন সে ঢেউ
করেছি পান,
মোদের উদরে সে ঢেউ পেয়েছে লয়,
পারে নি নড়াতে অনড় মোদের জগন্নাথের রথে—
বিপুল বিরাট দুর্মদ রথ চলে নাই এক তিল

আমাদের যুগ আজো যে মধ্যযুগ—
সিনেমা-রেডিও-টেলিভিশনের 'কোটিং' যদিও পড়েছে
তাহার গায়ে,
'কোটিং' উঠিতে লাগে বা কতক্ষণ।
পোড়া-মাটি আর বালু-পাথরের জড়-রূপটাই মোদের
সত্য রূপ।
অনড় মাটির কে গাহিবে জয়গান।

মোদের মুক্তি ? আধখানা তার পীরদরগায় এখনো
সিন্নি মাঝে,
পাদোদক আর তাবিজ-মাছলি, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে ,
বাকি আধখানা গ্যানোর ফিজিক্স, চরকসংহিতায়।
বিজ্ঞান আর দেবে মিলিয়া প্রায় মাঝামাঝি বিংশ
শতাব্দীতে
ঘরে ও বাহিরে অদ্ভুত খেলা খেলিছে বঙ্গদেশে—
এ যুগে মোদের প্রত্যেক ঘরে অহরহ চলে সেই দড়ি-
টানাটানি—
কভু বিজ্ঞান কভু দেবের জয়।
অতি বিচিত্র কোলাকুলি কভু আদিমে ও আধুনিকে—
জ্ঞানে সংস্কারে মধুর সমন্বয়।

কোথা সে চারণ, এই দ্বন্দ্বের যে গাহিবে ইতিহাস,
গাহিবে এবং ভাসিবে চোখের জলে ?

অতি-পুরাতন ঘুম-জড়া চোখে লেগেছে কখন খর
টর্চের আলো,
বিস্ময়ে ভয়ে শয্যায় জেগে ভাবিতেছি কাজে বাহির
হইতে হবে।
জড়তা রয়েছে জড়ায়ে অঙ্গখানি,—
কর্ণবাতুল বংশী অদূরে আকাশ চিরিয়া ডাকিছে মুহুর্মুহু,
পঞ্জিকা-পুথি খসিয়া পড়েছে কম্পিত হাত হতে ,

হঠাৎ এ বুকে রূঢ় পদাঘাতে স্মরণ হয়েছে কারাগারে
আছি শুয়ে,
ডাকিছে প্রহরী, ভোর হ'ল, জাগো জাগো।
ঘানির গাছে সরিষা কাঁদিছে, আমারে মুক্তি দাও,
পারি না বহিতে এ দেহে তৈলভার।
এ আধ-আঁধারে জাগিয়া চকিতে প্রায়নিবদ্ধ
কারাকক্ষের মাঝে
অনভ্যাসের প্রথম আবেগে কঠিন দেয়ালে কপাল
গিয়াছে ঠুকে।
সেই ব্যাকুলতা এ যুগের কবি বুঝিতে পারিয়া লিখেছে
সাহস করি,
বলেছে, বন্দী, এই তো মুক্তিপথ?

আমরা সহজ নহি—
স্কন্ধে অতীত ভর করিয়াছে, ভূতের প্রকোপে জটিল
মোদের মন।
ভবিষ্যতের ওঝারা আসিয়া নির্মম করে করিতেছে
কশাঘাত,
বর্তমানের হতাশাপঙ্কে আমরা পড়িয়া শুধু খাইতেছি মার,
অতীত কখনো প্রবল, কভু বা প্রবল ভবিষ্যৎ—
দুয়ের দ্বন্দ্বে মোদের বর্তমান।
সহজ মনের অনুভূতি দিয়ে বর্তমানেরে দেখেছে সে
কোন্ কবি

আপন চোখের সহজ দৃষ্টি দিয়ে—
পাউণ্ড লরেন্স হাক্সলির চোখে নয়!

এ যুগের কথা কহিবে কোথায় সে কবি উদার-প্রাণ,
ক্ষুদ্র হিমালয় আকাশ বাতাসে নিন্দা না করি
নূতনত্বের মোহে—
পত্তনোত্থানে, প্রেমে ও দ্বন্দ্বে গাবে মানুষের জয়—
বন্দী মানুষ, ব্যর্থ মানুষ,' পীড়িত মানুষ—তবু
মানুষের জয়।

চৈত্র, ১৩৪৪

# কবি

( 'নিরুক্ত'-সম্পাদক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে লিখিত )

এসেছে বন্ধু, নূতনের দিন, পুরাতন সে কি বাতিল হ'ল ?
পুরাতন সুর পুরাতন কথা পুরানো আকাশে ভাসিছে আজো।
টেস্ট-টিউবের শিশুরা এখনো ফেলে নি চরণ ধরার বুকে,
বিবাদ বাধে নি অতি-পুরাতন নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে।
তথাপি শুনেছি, কাব্য নূতন জন্ম নিয়েছে বাংলা দেশে—
কবে ও কোথায় প্রাচীর-পত্রে আজো দেখি নাই বিজ্ঞাপন।
হয়তো এখনও পিছিয়ে রয়েছি ; সিঁড়ির তলার গুমট ঘরে
পুরানো বাদুড়-চামচিকাদের পাখার গন্ধ পাচ্ছি তাই।
ছাদের সাজানো বাগানে হয়তো ফুটে ঝ'রে গেল নূতন ফুল—
উপরের হাওয়া ভুল ক'রে হায়, ভুলিয়ে গেল না অন্ধজনে।

ভূগোলে পড়েছি—এ মাটির ঢেলা ছিটকে এসেছে সূর্য্য হতে।
সূর্য্যের পানে ছুঁড়িয়াছে কেহ, সে কথাও তুমি বলিতে পারো।
জ্বলজ্বলে ঢেলা, নীল শিখা তার ধীরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'ল ;
পাঁজরার হাড়, তলায় তাহার বাষ্প-বিকার আজিও আছে।
ধীরে ধীরে ধীরে মাটি ও পাথর জমিয়েছে আসি বাষ্পের 'পরে,

তীব্র আবেগে আহত বাষ্প মাঝে মাঝে তবু গর্জি উঠে।
সবচেয়ে সেই বাষ্প প্রাচীন, তবু যে বন্ধু, নূতন ঠেকে—
বাধা-বন্ধন ভেঙে ফেলিবার সে আবেগ, সে তো আদিমতম!

নূতনের কথা যে বলে বলুক, তুমি বলিও না 'প্রথমা'-কবি;
বাদলা-পোকারা শাসির কাচে চিরকাল এল ঠুকিয়া মাথা,
ছন্দে গাঁথিয়া তাহাদের কথা না বলিলে বল কাহার ক্ষতি—
আলোকের মোহে খসবেই পাখা—ধরণীর ধুলা পরমা-গতি।
তুমি আমি তাই, প্রত্যেকে মোরা পাখা পুড়িবার পেতেছি
ব্যথা।

ছন্দে অথবা ভাষায় যে কেহ করিবে সৃষ্টি পাখার মোহ
কবি যে তিনিই, তাঁরেই আমরা মাটির ধরায় প্রণাম করি,
বাল্মীকি ব্যাস কবি কালিদাস রবীন্দ্রনাথে প্রণাম করি—
এ যুগে যাহারা যুগের ভাষায় নূতন ছন্দে সৃজিছে মোহ
প্রণাম তাদের সকলেরে করি, যাহাদের সুর মর্মে পশে।
সামনে রয়েছে এই ধরণীর অঙ্ক জ্যামিতি-বীজগণিতও,
ইতিহাস আর ধনবিজ্ঞান খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে জেগে—
আর যন্ত্র প্রয়োজন-হেতু তাহারা সবাই সত্য জানি—
সত্য হ'লেও সবখানি নয়; চোখের আড়ালে আরো কি আছে!
অজানা 'আরো'র খবর বন্ধু, কবিদের কাছে কামনা করি—
ছন্দ ও ভাষা থাক নাই থাক, মনে যেন মোহ সৃজন করে।

অন্তরে যার ধাতুর বিকার বাষ্পের বেগে ঘুরিছে জোরে,
মাটি-আবরণ দুর্দিন তাহারে শান্ত করিয়া রাখিতে পারে;

দুদিনের সেই ছন্দ ভাঙিয়া অগ্নিবর্ষী ধাতুর জ্বালা
হবেই বাহির, আগ্নেয়গিরি ধোঁয়ায় দেখি যে ক্রেটার-মুখে।
নূতন অথবা পুরাতন কোনো আইন-কানুন চলে না হেথা,
চলে নি কখনো, চলবে না জানি অর্থবিহীন কথার ফাঁকি।
ধাতুর অস্ত্রে বুকের রক্ত লাল করিয়েছে ধরার মাটি—
রক্তসিক্ত মৃত্তিকা ফুঁড়ে শ্যাম তৃণদল তুলিছে মাথা।
যে আবেগ আর বেদনা বন্ধু, রয়েছে পাতার অন্তরালে—
ছিল চিরকাল, রহিয়াছে আজো, থাকিবে সুদূর ভবিষ্যতে—
সেই সে আবেগে রূপ পেল ভাষা, বেদনা ছোঁয়াল সুর যে তাতে,
বুকের রক্তে তাহাই আবার রহিয়া রহিয়া শিহর তোলে।
মোরা গান গাই—সুরের লহরী ভাসিয়া বেড়ায় আকাশ-পটে,
ভাষা বুঝি আর নাই বুঝি তার মানুষের মন কেমন করে।
তত্ত্বের কিছু বুঝি না বন্ধু, জানি এইটুকু পরম লাভ,
এ লাভের লোভে তোমাদের সাথে পুরাতন প্রাণ মিলিতে চায়।

যুগ-মানবের অবসর কোথা, বিষ-জর্জর হায় মানব,
নীলকণ্ঠের জটার গঙ্গা ভুলেছে কি তবু কলধ্বনি?
হিসাবের খাতা বাগাইয়া ধরি, হিসাবের ভুল হতেছে তবু—
চাঁদের আলোকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিছে নিরেট বৈজ্ঞানিকও।
নূতনের মাঝে পুরাতন ভুল দেখিয়া ভরসা হয় আজিও,
ল্যাবরেটরির সন্ধান শেষ, শেষ কথা তবু গোপন থাকে।
কাব্যের মোহে বাঁধা পড়ে আজো অব্যক্তের সেই তো লীলা,
বিজ্ঞান যেথা হার মেনে যায়, কাব্যের গতি অবাধ সেথা।

ভাদ্র, ১৩৩৭

## বঙ্কিমচন্দ্র

ঘোর দুর্গম অতি-বিস্তার গভীর অরণ্যানী—
গর্বিত শিরে দাঁড়াইয়া আছে হাজার বনস্পতি,
শাল্মলী শাল শিশু তিন্তিড়ী আম্র পনস দেবদারু সারে সার।
পাতায় পাতায় মেশামেশি হয়ে চলে অনন্ত শ্রেণী,
বিচ্ছেদহীন ছিদ্রবিহীন রবিরশ্মির নাহি অবকাশ-পথ,
বায়ুতরঙ্গে তরঙ্গায়িত শতক্রোশ-ব্যাপী বারিধি পল্লবের—
এপারে উঠিয়া ওপারে ভাঙিছে সুদূরপ্রসারী সবুজ পাতার ঢেউ,
অতল নিয়ে গহন অন্ধকার।
অমাবস্যার তিমির-রাত্রি সূর্যদীপ্ত প্রখর দ্বিপ্রহরে,
অস্ফুট আলো আঁধার ভয়ংকর।
বৃক্ষপত্র-মর্মর; আর নিয়ে শ্বাপদ, কুলায়ে কুলায়ে পাখী—
থাকিয়া থাকিয়া আর্তকণ্ঠে উঠিছে তাদের বিলাপ-কাতর ধ্বনি;
যেতেছে মিলায়ে তরঙ্গহীন নৈঃশব্দ্যের মাঝে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।
তরল তিমির অরণ্যশাখে নিবিড় হয়েছে যেন,

জটিল হইয়া কাণ্ডে কাণ্ডে বেঁধেছে গ্রন্থি শত—
পায়ের তলায় সাপের মতন জড়াইয়া পাকে পাকে
রচিয়েছে যেন কুটিল জটিল পিচ্ছিল শত বাধা।
স্তব্ধ এখন গভীর অরণ্যানী।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু কীট পতঙ্গ বিহঙ্গ অগণন
আতঙ্কে যেন নিশ্বাস রুধি আছে।
অন্ধকার সে তবু হয় অনুভব,
অননুভব এ নিস্তব্ধতা শঙ্কিত পৃথিবীর।

বিদারণ করি নিশীথ-তিমির
বিদারণ করি স্তব্ধতা ভয়াবহ
ব্যাকুল কণ্ঠে কে শুধায়, "প্রভু, হবে কি সিদ্ধ আমার মনস্কাম?"
নিবিড় তিমির কাঁপিয়া কাঁপিয়া যায়।

পড়িতে পড়িতে অজ্ঞাতসারে সে বনগহনে হারায়ে ফেলায় পথ,
শুনিনু কে যেন কাতর কণ্ঠে কাহারে শুধায় তিমির মথিত করি,
"হবে কি সিদ্ধ, হে প্রভু আমার, হবে কি সিদ্ধ একটি মনস্কাম?"

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী—
প্রান্তরপথে চলিতেছিলাম প্রিয়সখা ভবানন্দের সাথে,
মল্লার রাগে প্লাবিয়া আকাশ গাহিতেছিলেন গুরুগম্ভীরনাদে—
জন্মভূমির বন্দনা-গীতি সে 'বন্দে মাতরম্'।
নয়নে অশ্রু উথলি উঠিল মোর,
লক্ষ স্বর্গ হতে গরীয়সী মহীয়সী মা আমার।

রজনী প্রভাত, বিজন কাননভূমি—
পক্ষীকূজনস্পন্দিত সেই নন্দিত বনভূমি,
'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ বসিয়া যেথায় অজিন আসন 'পরি।
পরম আদরে দেখালেন মোরে মা-র মন্দিরে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে,
মা যাহা ছিলেন, মা যাহা আছেন, যাহা হইবেন জগদ্ধাত্রী
মাতা।
সভয়ে চকিতে মায়েরে প্রণাম করি
আর্তকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে তাঁর বন্দনা-গান,
'আনন্দমঠে' 'সন্তান'দলে লিখিয়া আপন নাম
ব্রহ্মচারীর চরণে বসিয়া দীক্ষিত হইলাম।

মা-র সন্তান ফিরিতেছি পথে পথে—
মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষের উঠিয়াছে হাহাকার,
মন্বন্তরে জাগিয়াছে মারীভয়।
শব আছে, শুধু জ্বলে নাকো চিতা, অধূম শ্মশানভূমি ;
রাজার শাসন তারি মাঝখানে ফিরিছে পীড়ন-রূপে,
শোষক ফিরিছে শাসক-ছদ্মবেশে।
সহসা শূন্য যোগে
গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনিল কামান সম্মুখে আশেপাশে,
বিশাল কানন কম্পিত করি ধ্বনিল মুহুর্মুহু—
দূর নদীপথে ভেসে গেল তার ভীষণ প্রতিধ্বনি।
জননী-সেবার সন্তান মোরা চমকি জাগিনু মৃত্যু-আহব মাঝে ;
ভগ্ন হস্ত, কর্তিত পদ, মুখে অবিরাম সে 'বন্দে মাতরম্'।
মৃত্যুর মাঝে রাজায় প্রজায় শেষ হ'ল বোঝা-পড়া।

অর্জ্জন কেহ করিছু পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিছু কেহ—
মন্বন্তরে নূতন অভ্যুদয়।
সন্তান-নেতা সত্যানন্দ, কে মহাপুরুষ ধরিলেন তাঁর হাত,
লইয়া তাঁহারে গেলেন সুদূর নিরুদ্দেশের পথে—
প্রতিষ্ঠা গেল, আসিল বিসর্জ্জন।

ত্রিস্রোতা নদী তারি তীরে তীরে অরণ্য সুগভীর,
গহনে তাহার সুড়ঙ্গপথে আঁধার ধরণীতলে
প্রস্তরে গড়া পুরাতন দেবালয়।
বনপথ ধরি একাকী চলিছে তাঁ'রা সেই দেবালয়ে
দস্যু-নেত্রী সে দেবী-চৌধুরাণী,
ধরাগর্ভের মন্দিরে যেথা দীপ জ্বলে মিটিমিটি।
স্তিমিত আলোকে দেখি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পূজা,
পূজারী দস্যু ভবানী পাঠক নিজে।
বাঙালী মেয়ের রূপ দেখিলাম দস্যু-নেত্রীর চোখে,
সন্ন্যাসিনী সে ভগবতী তবু সাক্ষাৎ রাজরাণী—
রূপেতে লক্ষ্মী, মঙ্গলময়ী বরাভয় দুই করে;
অযাচিত দানে লোভী সন্তানে পালন করিছে মাতা।
যোগশাস্ত্র ও ভগবদ্গীতা গুরু ভবানীর কাছে
শিখিয়া সকল কর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়াছে।

হরবল্লভ রায়ের বাড়িতে খিড়কি-পুকুরঘাটে
ঘোমটায় মুখ ঈষৎ ঢাকিয়া বসে বাসন মাজিছে নূতন বধূ—

সাগর-বউয়ের সাথে সাথে মোরা নূতন বউয়ের দেখিনু
নূতন রূপ।
রূপার সিংহাসনে যে বসেছে হীরার মুকুট শিরে,
গীতার ধর্ম্ম শিখিয়া যে জন নিষ্কাম রাজরাণী,
দাসীর মতন করে সেই গৃহকাজ ;
নারীর ধর্ম্ম রাজত্ব করা নয়—
কঠিনতর যে ধর্ম্ম তাহার পালন ঘরের কাজ,
কোনো যোগ চেয়ে সহজ নহে এ যোগ।
নিরক্ষরের স্বার্থপরের অনভিজ্ঞের দলে রহি প্রতিদিন
সরল সেবায় সকলেরে সুখী করা।
কেহ জানিল না জ্ঞানের বহ্নি জ্বলে অন্তর মাঝে,
নিষ্কাম তবু সুকর্ম্মপরায়ণা—
বাহিরে ভিতরে আসল সন্ন্যাসিনী।
ভবানী ঠাকুর হাতে গড়িয়াছে শাণিত কুঠার সম
সহজে ছিন্ন করিতে সে পারে অতীব জটিল গ্রন্থি সংসারের।
কেহ জানিল না ছেদন করিল কি যে,
কেহ জানিল না আপন মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িল কি না
সে দেবী-নিবাসে প্রবেশ করিনু পড়িতে পড়িতে এ
'দেবী চৌধুরাণী'—
শুনিলাম বাণী—নিরাশ জনের পরমাশ্বাস-বাণী,
'দুষ্কৃতে নাশ, সাধু-সুজনের পরিত্রাণের লাগি,
স্থাপিতে ধর্ম্ম সংসারে তাঁর সম্ভব যুগে যুগে।'

সপ্তমী পূজা—কমলাকান্ত বসেছে আফিম খেয়ে,
তার সাথে সাথে আমি দেখিলাম, চলিছে কালের স্রোত,
দিগন্ত ব্যেপে চলিছে প্রবলবেগে—
ভাসিয়া চলেছি তারি মাঝখানে ক্ষুদ্র ভেলায় চড়ি,
ভাসিয়া চলেছি অসীম অকূলে ভীষণ অন্ধকারে ;
বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গ নীচে, ঊর্ধ্বে তারকা জ্বলে—
কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান, কভু নিবিয়া নিবিয়া যায়।
মনে হ'ল, আমি একা নিতান্ত অভাগা মাতৃহীন,
কালসমুদ্রে ভাসিয়া চলেছি সে মাতৃ-সন্ধানে—
কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি জননী বঙ্গভূমি।
চকিতে দেখিনু দূরে বহুদূরে প্রভাত-অরুণ-আভা,
স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল যেন।
বায়ু-তরঙ্গ তাড়িত সলিলে স্বর্ণকান্তি প্রতিমা সপ্তমীর
হাসিছে ভাসিছে ছড়াইছে আলো, দিঙ্মণ্ডল আলোয়ে
আলোকময়—
সভয়ে চিনিনু এই তো আমার জননী জন্মভূমি ;
রত্নাভরণ-ভূষিতা জননী মৃণ্ময়ী মা আমার—
দশ ভুজ তাঁর প্রসারিত দশ দিকে।
পদতলে তাঁর পীড়িত শত্রু—শত্রুবিমর্দ্দিনী,
ডাহিনে ভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বাণী বাগ্দেবী,
সমুখে বসিয়া ত্রিভুবনজয়ী কুমার কার্ত্তিকেয়,
সিদ্ধিপ্রদাতা গণেশ অন্য পাশে।
সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা ভাসে কালস্রোতোজলে,
তাঁহার চরণে দিনু পুষ্পাঞ্জলি।

দেখিতে দেখিতে কাল-সমুদ্রে ডুবিল প্রতিমাখানি—
মনের মানসে বিধি আজো মিলাল না।
মনুষ্যত্ব গেলে নি মোদের, ঐক্য-বিদ্যা-গৌরব ঈপ্সিত ;
সুখ-দুঃখের সীমা-রেখা পার, নষ্ট সুখের স্মৃতি,
চাহিবার শুধু পড়িয়া রয়েছে বিরাট শ্মশানভূমি।
কুলুকুলু নদী বহিছে গঙ্গা সে মহাশ্মশান বেড়ি,
একদা নিশীথে নীরবে জননী লজ্জায় মুখ ঢাকি
শঙ্কিত পায়ে নামিলেন,জলে বাহিয়া সোপানাবলী,
নিবিড় তিমিরে নির্ব্বাণমুখ আলোকবিন্দুবৎ।
ক্রমে ক্রমে সেই মহা-তেজোময়ী বিলীন সলিল-তলে ;
কাঁদে সন্তান শ্মশান-শয়নে, তবু না উঠিল মাতা।
কবে উঠিবেন ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা তার করি।

সম্মুখে মোর প্রাচীর-পাত্রে ঝুলে আলেখ্যখানি—
আলেখ্য নয়, সুতীক্ষ্ণ অসি ঝলিছে নয়ন-আগে।
নিবিড় তিমির এ অসি-ফলকে খণ্ড খণ্ড করি
হয়তো একদা মোর অরণ্যে মিলিবে চলার পথ।

চৈত্র, ১৩৪৩

# আমরা

আমরা পড়েছি মন্বন্তর-মুখে ;
পৃথিবী জুড়িয়া হেরি দেশে দেশে হিংসার হানাহানি,
পশুশক্তির ঘৃণ্য বিকারে মানব-ধর্ম কাঁদে।
শাশ্বত যাহা ক্ষণিকের ঘায়ে করিতেছে টলমল—
মনে হয় যেন চিরবিলুপ্তি খোঁজে।
আমাদের কাজ এ আঁধ-আঁধারে এই গাঢ় কুয়াশায়—
বিমূঢ় চকিত ভীত অসহায় মানবের প্রাণে প্রাণে
নিত্য আলোর পিপাসা জাগায়ে রাখা,
তিমিরের ভয় কুয়াশার ভয় মন হতে করা দূর ,
সবারে ডাকিয়া বলা—
এই সংশয়-বিকারের মাঝে অভয় জাগিয়া আছে।
সবার ঊর্ধ্বে মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবের প্রাণ
চলে অবিচল স্থির লক্ষ্যের পানে।
আমরা চারণ, সে মহাপ্রাণের বন্দনা-গান গাহি,
গাহি জয় মানুষের—
মর্ত্যের মাঝে মৃত্যুর মাঝে যে মানুষ চিরজীবী।

১১ ফাল্গুন, ১৩৪৮

## গোপীনাথ গুঁই

মোজেইক-বনিয়াদে পড়েছে কালের কশাঘাত,
মেঝেতে বসিয়া আছি কীটজীর্ণ কার্পেট-আসনে,
পশমেতে "আশীর্ব্বাদ" অর্দ্ধেক পোকায় গেছে খেয়ে।
অতি স্বচ্ছ কূপোদক টলমল রূপার গেলাসে,
ভুবড়িয়া গেছে, তবু নামী ধাতু ঝকঝক করে।
বসিয়াছি স-জাঁকজমকে।
আমি গোপীনাথ গুঁই, ভাঙা লোহা-লক্কড়ের কাজে
বিপুল মুনফা লভি বেঁধেছি এগারোখানা বাড়ি,
দুটি ব্যাঙ্ক, তিনখানা সুবৃহৎ ঢালাই-কারখানা
পাঁচ-হাজারী কাঠা এই কলিকাতা শহরের বুকে।
এসেছিনু শূন্যহাতে একদিন বোঁচকা-সম্বল—
মাত্র সেদিনের কথা, কুমিল্লার চাঁদপুর হতে।
তারপর ধাপে ধাপে উঠিয়াছি, তার ইতিহাস
আজ তো সবাই জানে, দীর্ঘতর হয় প্রতিদিন
সে কাহিনী চমৎকার। দুই পাতা বিজ্ঞাপন-লোভে

সকল সংবাদপত্রে বের হ'ল আমার জীবনী,
শুধুই সচিত্র নয়, শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের লেখা ;
পড়িয়া নিজেই আমি বনিয়াছি বহুত তাজ্জব ;
অত্যাশ্চর্য্য জীবনীর দাম মাত্র এক শত টাকা।
নেতৃবৃন্দ দকে দকে দিয়াছেন আশীর্ব্বাদ মোরে,
উচ্চ রাজপুরুষেরা জানালেন কে'ন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স,
ডক্টরেট-দানে ধন্য বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়,
বলাই বাহুল্য মোর উচ্চ রাজ-খেতাবের কথা।

আমি গোপীনাথ শুঁই, কি করেছি আমি শুধু জানি।
নারী, গাড়ি, বাড়ি আদি যেখানে যেটিতে পড়ে চোখ
সেটিই সংগ্রহ করি স্বর্ণ আর রৌপ্যের দাপটে ;
মানুষের দারিদ্র্য ও লোভ মাত্র সহায় আমার।
জাগে ক্ষুধা দেহে মনে, দালালেরা জোটে লোভে লোভে,
কভু নহি ব্যর্থকাম, বাড়ে শুধু দালালির হার।
আমারে ঠকাতে চায়, জানে না সে অর্থগৃধ্নু দল,
ঠকা আর জেতা মোর জীবনের এই মাত্র খেলা—
হার জিত উভয়ই সমান।
উঁচুগতি সুনিশ্চিত ব্যবসাতে নাহি আকর্ষণ,
চলে তাহা রোলারের বেগে—
সম্মুখে সকল বাধা আপন ওজনে পিষে যায়।
সহস্র বিকারে মোর উত্তেজনা শান্তি খুঁজে মরে,
রজনীর অন্ধকারে খেলা মোর রহে যে গোপন।

সুনিবিড় তমিস্রায় নিদ্রাহীন লালায়িত চোখে
দেখি যে আকাশখানা তারা-হারে শোভিছে সুন্দর ;
চাঁদ ঢ'লে পড়িয়াছে, খণ্ড লঘু মেঘ ভেসে যায়,
ওড়ে নিশাচর পাখী। মনে কি বিষাদ জাগে মোর ?
নীতি-ধর্ম্মকথা ভেবে অনুভবি বিবেক-দংশন ?
ধর্ম্ম ? ভেবে হাসি পায়, হায় ধর্ম্ম, তোমার শাসন—
কুবেরের মানদণ্ডে চলে পাপপুণ্যের বিচার।

মনে পড়ে, একদিন আমি ছিনু গ্রামের দুলাল,
আমি গোপীনাথ শুঁই, পাঠশালে পাঠ সাঙ্গ করি
জমিদার-কাছারিতে চেক আর দলিলাদি লিখে
বৃদ্ধা জননীর হাতে কটি টাকা দিতাম তুলিয়া।
মাতা ও পুত্রের অন্ন নিরুদ্বেগে হ'ত যে তাতেই ;
আসিত ক্ষেতের ধান, হাঁড়ি কয় ভাল একো গুড়—
সরল জীবনযাত্রা, ছাতা আর লণ্ঠন বিলাস ;
চলিত জীবন মম লঘুপক্ষ পাখীর পাখায়।
সুখের নাহিক শেষ। বিয়ে হ'ল পাশের গাঁয়েতে,
ঘরে এল কনেবউ, ভাঙা ঘরে চাঁদের কিরণ ;
মায়ামন্ত্রবলে যেন রাত্রি মোর স্বপ্নময় হ'ল,
ছুটে গেল দিনগুলি সম্রাটের রাজৈশ্বর্য্য নিয়ে।

আজ মনে পড়িতেছে ললিতার মুখের হাসিটি—
লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে সে হাসি দেখিতে নাহি পাব ;
আমি গোপীনাথ শুঁই, বহু লক্ষ মুদ্রার মালিক।

সুখের বাসরঘরে ছিদ্রপথে পশে কালসাপ,
পাপিষ্ঠের পাপচক্রে জলাশয়ে মিলাল সে হাসি,
অকালে মরিল সতী লম্পটের লোলুপ পরশে,
অকরুণ আত্মঘাতে—সহস্র বর্ষের সংস্কার!
মিথ্যা চৌর্য্য-অপরাধে আমারে আটক করে জেলে
জমিদার শক্তিমান—ঈশ্বরের সত্তা প্রতিনিধি।
আঁধার কুটীরে মোর জননী মরিল কেঁদে কেঁদে—
এইটুকু ভাগ্য, তাঁর শেষ কান্না হয় নি দেখিতে।

ধর্ম্ম। হায় ধর্ম্ম, তুমি দ'হাতে রাখ নি সেই দিন,
আমার কবল হতে আপনারে নারিবে রাখিতে।

বাহিরিনু জেল হতে, বিদ্রোহ যে করিনু ঘোষণা
তোমার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম, সাধনা হইল মোর শুরু।
দেখিতে পেতাম যদি ললিতার মৃত মুখখানি
হয়তো বিদ্রোহ মোর শেষ হ'ত নয়নের জলে।

তারপর—এক দিকে শঠ আমি, কুবেরের চর,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ, ছুরি হানি বিশ্বাসের বুকে।
বাহিরে পরার্থ-চিন্তা—স্বার্থদুষ্ট পঙ্কিল অন্তর,
সহজ-প্রত্যয়ী জনে হত্যা করি অকুণ্ঠ আঘাতে।
অন্য দিকে শয়তান, পিশাচের নিষ্ঠুর কিঙ্কর,
মৃত্যুরে না ডরি কভু, ঘৃণা-লজ্জা-পাপবোধ নাই;

উচ্চপাপ-সাধনায় প্রকাশ্যে করি না ক্ষুদ্র পাপ—
সতর্ক হইতে কভু দিব না যে অসতর্ক জনে।
সমাজের ঘেয়ো গায়ে মুহুর্মুহু ছিটাই লবণ—
আমার পাপের ঘায়ে মোর ধর্ম্ম করে আর্ত্তনাদ,
টুঁটি টিপে মারিয়াছি তারে।

পত্রিকার পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সচিত্র আমার জয়গান—
আমি গোপীনাথ শুঁই, লক্ষ টাকা মাসিক মুনাফা।
শহরের সন্নিকটে ব'সে আছি বিদীর্ণ প্রাসাদে
পুরাতন রাজবাড়ি, লাগিয়াছে অলক্ষ্মীর ছোঁয়া—
মোজেইক-বনিয়াদে লেগেছে কালের কশাঘাত;
মেঝেতে বসিয়া আছি কণ্টকজীর্ণ কার্পেট-আসনে।
দালাল দিয়াছে খোঁজ বাড়িখানা হইবে বিক্রয়,
বাড়ি ছাড়া আরো কিছু সুগোপন দিয়াছে সন্ধান—
আসিয়াছি মাংসলোভে, ব'সে আছি তারি প্রতীক্ষায়।
জলতলে শ্বাসরুদ্ধ ললিতার ম্লান মুখখানি
আকাশে ভাসিছে যেন, ক্ষণে ক্ষণে ঘটিতেছে ভুল।

ব'সে আছি ব্যগ্র প্রতীক্ষায়—
প্রাচীন বনেদী বংশ, ছিন্ন কাল-চক্র-আবর্ত্তনে,
শত খণ্ডে হেথা হোথা খুঁজিতেছে চরম বিলোপ;
তারি এক খণ্ড হেথা কায়ক্লেশে বাঁধিয়াছে বাসা—
বজ্রাহত বনস্পতি, পুরাতন পৈতৃক প্রাসাদে;

বিপত্নীক পিতা আর বিধবা যুবতী কন্যা তার,
পরমাসুন্দরী সে যে, হু শিয়ার দালালের কথা।
যত মূল্য লাগে দিব, প্রাসাদে প্রসাদজীবী করি
পিতারে রাখিব বাঁধি—তারপরে মন্মথের জয়।
অত্যাচার? পশুশক্তি সে আমার যথেষ্টই আছে,
আমি গোপীনাথ গুঁই, শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক;
উচ্চ রাজপুরুষেরা জোড়হস্ত গরুড়ের মত
প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রান্তে আমারে সেলাম করি যায়,
লোলুপ লালসে বসে দৈনন্দিন খানার টেবিলে,
চাকরের মত রহে আমার করুণা-কণা যাচি।
করেছি চূড়ান্ত "না" যে জলজ্যান্ত বহু স্পষ্ট "হাঁ"কে।
অত্যাচার! দয়া বল মোর।
যা খুঁজিবে তাই পাবে বজ্রাহত বিশেশ্বর বসু,
দৈন্য আর ঋণ তারে জর্জরিত বিপন্ন বন্দী,
পুরাতন বাড়িখানা যথামূল্যে খরিদ করিয়া
কন্যামূল্যে রেখে দিব চিরদিন তাহারি জিম্মায়।

চুকেছে কাজের কথা, গৃহকর্তা জানান মিনতি,
কিছু জলযোগ করি যেতে হবে দীনের নিবাসে।
জল যে হয়েছে দেওয়া ঝকঝকে রূপার গেলাসে,
যোগ আসি পৌঁছে নি তখনো।
দালাল পিতারে ল'য়ে গিয়েছে চৌহদ্দি পরিমাপে,
আমি গোপীনাথ গুঁই, কন্যার প্রতীক্ষা একা করি।
চকিত হইয়া উঠি—অগ্নিশিখা নিবিড় তিমিরে

ধীরে ধীরে পশে যেন সচল নারীর মূর্তি ধরি ;
বিধবার বেশ-ভূষা ভেদ করি অগ্নি অনির্ব্বাণ
আমারে ছুঁইয়া গেল, চিত্ত মোর করে আর্ত্তনাদ।
কি করিব, কি বলিব, ক্ষণকাল বুঝিতে পারি না।
অগ্নি কথা কয়। বলে, শ্রীমতী অণিমা মোর নাম,
শুনেছি দীনের প্রতি আপনার দয়া সীমাহীন,
এ দীনার লউন প্রণাম।

অগ্নিমুখে স্তুতি শুনি মনে মনে উঠিনু শিহরি,
হাসিলাম ম্লান হাসি, বলিলাম, ব্যবসায়ী আমি,
মূল্যপণে বেচি কিনি, চেষ্টা করি দিতে ন্যায্য দাম,
ব্যবসায়ে নাহি সাজে অকারণ দাক্ষিণ্য-মহিমা।

ত্রস্তপদে কাছে এল দ্বিধাহীন শ্রীমতী অণিমা,
খাবারের থালা নয়, একটি অ্যাটাচি-কেস হাতে—
বলিল, সময় নাই ; সামান্য মিনতি মোর আছে,
আপনি মহৎ জন, একমাত্র আশ্রয় আজিকে।
আমি অতি অসহায় ; মোর এই সম্পত্তিটুকুরে
সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, সংগোপনে হইবে রাখিতে।

সবিস্ময়ে চাহিলাম তার পানে প্রশ্নাতুর চোখে।
স্থিরকণ্ঠে বলিল অণিমা,
শুনেছি আজিকে হবে পুলিসের শুভ-আগমন
তব জীর্ণ এ প্রাসাদে, এরি 'পরে তাহাদের লোভ—
সহজ বিশ্বাস করি আপনারে সঁপিয়া দিলাম।

ধরিনু অ্যাটাচি-কেস, কি কথা যে বলিতে গেলাম
আজ তা পড়ে না মনে, পদশব্দে হলাম চকিত,
পাশের দরজা দিয়া পশিলেন বিশ্বেশ্বর বসু,
দালাল তাঁহার সাথে ; ডাকিলেন, কোথায় অণি মা,
বিদুরের খুদকুঁড়া এখনও কি হয় নি সংগ্রহ ?

থাক থাক, তাড়া কেন !—শুষ্ককণ্ঠে আমি কহিলাম।
খাবারের থালি হাতে প্রবেশিল তখনই অণিমা
সসংকোচে ভয়ে ভয়ে। মনে হ'ল আর কোনো মেয়ে,
কিছু আগে যে আসিয়া মোরে দিয়ে গেল গুরুভার
এ যেন সে জন নয়। অন্তরালে দাঁড়াল অণিমা।

কাজ শেষ হ'ল মোর, পাকা দেখা তাও হ'ল শেষ ;
“আবার আসিব” বলি স-দালাল ফিরিয়া এলাম,
সযত্নে সিন্দুকে তুলে রাখিলাম গচ্ছিত বস্তুরে।
অনুমানে বুঝিলাম, মূল্যবান কি তাহাতে আছে—
খুলিয়া দেখি নি আমি, প্রয়োজন বুঝি নাই তার।
জলন্ত আগুন ছুঁয়ে চিত্ত মোর জ্বলিছে তৃষ্ণায়,
নিমেষে বিলুপ্ত হ'ল সব পূর্ব্ব-সম্ভোগের স্মৃতি—
ছেলেবেলা করিয়াছি বরফের শয্যাসঙ্গী হয়ে ;
আগুন, আগুন চাই, জ্বলে পুড়ে খাক হতে চাই,
ভস্মীভূত এ শ্মশানে অগ্নিশিখা কচিৎ দেখি যে !

সেই দিন হতে মোর ধ্যানজ্ঞান আগুনবিলাস ;
যাই আসি কথা কই, পিতাসহ কন্যা আসে কাছে,
সঠিক সুযোগ খুঁজি থাবা পাতি প্রতীক্ষা বাঘের !
আগুন বরফ জল—যাই হোক স্বরূপ তাহার,
থাকে না গোপন কভু পুরুষের উদগ্র কামনা
নারী-প্রকৃতির কাছে ; অণিমার মুখে ম্লান হাসি—
সাপের ছোবল আসে পাথরেতে প্রতিহত হয়ে
পাথর তবুও শুনি বিষে জর্জ্জরিত হয়ে যায়।

সপ্তাহান্তে শুনিলাম পুলিসের সদম্ভ প্রবেশ,
পায় নাই কিছু সেথা তন্নতন্ন সন্ধান করিয়া,
তবু নিয়ে গেছে ধ'রে অণিমাকে—বিধবা অণিমা।
সভীতি সজল চক্ষে কহিলেন বিশেশ্বর বসু,
ভাগ্য মোর, তা না হ'লে দুধ কলা দিয়ে কালসাপ
স্বেচ্ছায় পুষিব কেন, সংসর্গজ দোষ গুণ হয়।

কালসাপ !—হুঙ্কারিয়া উঠিলাম, কেন তা জানি না—
আমি গোপীনাথ গুঁই, মনে হ'ল গিয়াছি ঠকিয়া—
অমনি পড়িল মনে, মারণাস্ত্র আমারি নিকটে।
বলিলাম, সব কথা খুলিয়া বলিতে মোরে হবে ;
বিহিত করিতে পারি সত্য যদি প্রয়োজন বুঝি।
বিশেশ্বর বসু বলিলেন,
অণির স্বামীর বন্ধু নরেন্দ্রপ্রতাপ তার নাম,
মাঝে মাঝে আসে যায় যেন কালবৈশাখীর ঝড়,

দেশের মুক্তির লাগি সুনিভৃত সাধনা তাদের।
অণিমা প্রধান ভক্ত দেশকর্মী নরেন্দ্রগুরুর,
আরো আছে অনেকেই।
কেন আসে কেন যায়, আজো তাহা বুঝিতে পারি না,
অভিমানী মেয়েটার মুখ চেয়ে সব সহ্য করি।
দেশগত প্রাণ তার, দেশমাতৃকার মুক্তি লাগি
সমর্পিল আপনারে, বিধবার স্বদেশ সম্বল :

মিথ্যা কথা। অকস্মাৎ আর্তকণ্ঠে গর্জি উঠিলাম—
ভ্রষ্টা আপনার মেয়ে, নরেন্দ্রপ্রতাপ শয়তান ;
আমি জানি সর্বিশেষ শয়তানের তাড়িতে শয়তানি।

অকারণ উত্তেজনা, লজ্জা হ'ল, দেখিলাম চেয়ে,
কম্পাহারা বিশ্বেশ্বর জোড়হস্তে কাঁপিছে সম্মুখে ;
ললিতার মুখখানি কেন জানি মনে প'ড়ে গেল।

প্রশ্নে প্রশ্নে জানিলাম, নরেন্দ্রপ্রতাপ কেথা নাই,
অণিমা বলিয়া গেছে, আসিবে সে এই শনিবারে।
পুলিস পাহারারত ; বাঁচাইতে হইবে তাহারে।
আমি গোপীনাথ শুঁই, বহু প্ল্যানে কেঁদেছি ব্যবসা,
চকিতে অনেক প্ল্যান খেলে গেল মগজে আমার।
বলিলাম, ভয় নাই, অণিরে আনিব মুক্ত করি।

কি করিনু, অঘটন ঘটাইনু সে কোন্ কৌশলে—
পুলিসের হাত হতে মোর হাতে আসিল অণিমা ;
কন্যারে ছাড়িয়া তারা নিয়ে গেল পিতা বিশ্বেশ্বরে।

সঙ্গীহীন ভগ্নপুরী, অণিমারে রক্ষা করি আমি,
লম্পটের সপ্রতিভ লজ্জাহীন হাসিখানি মুখে
নিবেদন করিনু একদা,
আমি ঘোর বস্তুবাদী, বস্তুমূল্যে কাজ ক'রে থাকি,
বস্তুমূল্যে বাঁচাইতে পারি আমি নরেন্দ্রপ্রতাপে।

অণিমা উঠিল হাসি। শান্তকণ্ঠে বলিল সহজে,
তার এই দেহখানা, মূল্য তার সামান্য অতীব—
এর বিনিময়ে যদি মুক্তি পায় নরেন্দ্রপ্রতাপ,
প্রস্তুত সে রয়েছে সর্ব্বদা।
চমকিয়া উঠিলাম, এতখানি করি নি প্রত্যাশা।
চকিতে হইল মনে, এই আত্মসমর্পণ পিছে
আছে কোনো গূঢ়তর পলাতকা দুর্বুদ্ধি নারীর ;
ললিতার আত্মহত্যা কালো কৃষ্ণ-সায়রের জলে।

মোজেইক-বনিয়াদে লেগেছে কালের কশাঘাত,
পালঙ্কে শুইয়া আছি, দুগ্ধফেননিভ শয্যাখানা ;
অণিমা বসেছে কাছে—বৈদান্তিক আত্মসমর্পণ।
আমি গোপীনাথ গুঁই, মাংসলোভী লোলুপ মার্জ্জার,
ইঁদুরে পাইয়া কাছে চিরন্তন খেলা ভুলিয়াছি।

ভয় লজ্জা অনুকম্পা—কেন কি যে জাগিতেছে মনে।
বাহিরে পাহারা দেয় পুলিসেরা গোপন পোশাকে,
সদর করিছে রক্ষা মোর ভৃত্য গুর্খা দ্বারবান।
প্রখর দিনের রৌদ্র, কক্ষে তবু নিশীথ-তিমির,
আর্তকণ্ঠে কা-কা করে আলিসায় এক জোড়া কাক।
বিহ্বল অলস চোখে অণিমার মুখপানে চেয়ে
মনে হ'ল, বহু দূর—নাগালের বাহিরে সে আছে।
মনে মনে ভয় হ'ল, বলিলাম, কাছে এস অণি।
অণিমা দাঁড়াল উঠি, বলিল, মায়ের এই ঘর।

শিহরিয়া উঠিলাম, আমি প্রৌঢ় গোপীনাথ শুঁই,
লোহা-লক্কড়ের কাজে প্রাণ যার ইস্পাত-কঠিন,
নারীর ক্রন্দন, বাধা, আত্মদান—সমভোগ্য যার।
লজ্জা হ'ল, উঠিলাম অর্থহীন অট্টহাসি হেসে,
বলিলাম, শুন অণি দেবী,
গচ্ছিত বস্তুর তব আমি কিন্তু রেখেছি মর্য্যাদা,
মর্য্যাদা রাখিতে চাই দেশপ্রাণ তোমার গুরুর,
নরেন্দ্রপ্রতাপ যার নাম। মূল্যপ্রার্থী ব্যবসায়ী,
নাহি জানি কোন্ ভাবে নিজে তুমি ঋণমুক্ত হবে—
তোমার কর্ত্তব্য তুমি জান।

জানি, জানি, জানি তাহা।—ধীর কণ্ঠে বলিল অণিমা,
জীবন-মৃত্যুর মাঝে কতটুকু ব্যবধান জানি,
জন্মগত এ দেহ-সংস্কার, তার মূল্য কতটুকু

তাও আমি জানি। জানি আরো—অনেক অধিক মূল্যে
কিনিতে হইবে মোর জননীর লুপ্ত স্বাধীনতা।
এপার হইতে তাই সহজ বিশ্বাসে পারি যেতে
ওই পারে, দেহ নিয়ে যদি হয় কাজ জননীর
এ দেহ তাঁহারই ; আপনার—। শ্যামল অণিমা।

অপূর্ব্ব নারীর মূর্ত্তি দেখিলাম অস্পষ্ট আলোকে,
সুনিবিড় অন্ধকারে অচঞ্চল প্রদীপের শিখা—
স্থির বিদ্যুল্লতা যেন ঘনকৃষ্ণ-প্রাবৃট্ আকাশে।
সহসা্ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আমি,
প্রবল তাড়িত-শক্তি সঞ্চারিল শিরায় শিরায়।
অণিমা ডাকিল কারে, এস এস নরেন্দ্রপ্রতাপ।
নরেন্দ্রপ্রতাপ ? আমি রুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলাম চেয়ে
আগুনের শিখা যেন স্পর্শ করে আগুন-শিখায়।
চমকিয়া উঠিলাম, কোথা হতে এল যাদুকর,
আবির্ভাব যেন তার মোজেইক মেঝেখানা ফুঁড়ে !
শহরের বাহিরেতে প্রহরীবেষ্টিত এই পুরী,
তার মাঝখানে অতি অসম্ভব এই আবির্ভাব !

দেখিলাম, কম্পমান ঊর্দ্ধমুখী অচঞ্চল শিখা,
ঝড়ে কি পড়িবে নুয়ে নিরাশ্রয় বেতসের লতা !
আমি গোপীনাথ ভুঁই, অকস্মাৎ কি ঘটিবে জানি—
সবিস্ময় দৃষ্টি মেলি চাহিলাম অণিমার পানে।

হাস্যমুখে কাছে আসি হাত জুড়ে নমস্কার করি
আমারে করিয়া লক্ষ্য কহিলেন নরেন্দ্রপ্রতাপ,
আপনার জয়গান শুনিয়াছি অণিমার মুখে ;
আমার সময় নাই, আসিয়াছি এই শেষ বার,
অদূরে নিশ্চিত মৃত্যু প্রতীক্ষা করিছে মোর লাগি।
পিছু লইয়াছে তারা, অবিলম্বে আসিবে হেথায়,
তার পূর্ব্বে পলাইয়া অণিমারে বাঁচাইতে চাই।
অণিমারে ভালবাসি, ভালবাসিয়াছি চিরদিন,
কিন্তু তারো চেয়ে প্রিয় হতভাগা স্বদেশ আমার।
এ কথা বুঝাতে তারে কোনদিন পারি নাই আমি—
দেহ-প্রেম ক্ষণিকের, দেশপ্রেম সত্য চিরদিন।
নিরাশ্রয়া এই নারী, সঁপিলাম আপনার হাতে।
অগাধ সম্পত্তি তব শুনিয়াছি অণিমার কাছে,
যদি তার কিছু অংশ তারে দেন দুর্গত-সেবায় ;
কাজ ভালবাসে অণি, পরপারে শান্তি পাব আমি।
নমস্কার। অণিমারে লক্ষ্য করি নরেন্দ্রপ্রতাপ
কহিলেন, যাই অণি। তারপরে ঊর্দ্ধে হাত তুলি
আশীর্ব্বাদ করিল নারীরে। নারী নিল পদধূলি।
আমি গোপীনাথ শুঁই স্তব্ধদৃষ্টি দেখিলাম চেয়ে,
নিমিষে মিলায়ে গেল চলমান বিদ্যুতের শিখা।

মোজেইক-বনিয়াদে পড়েছে কালের কশাঘাত,
পালঙ্কে পড়িয়া নারী, দুগ্ধফেননিভ শয্যাখানি,
অবিরল জলধারে উপাধান গিয়াছে ভিজিয়া।

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। ডাকিলাম স্নেহরুদ্ধ স্বরে,
উঠ অণি, ডাকিতেছি হতভাগ্য দেশের সেবক—
আমি গোপীনাথ শুঁই। ধীরে ধীরে উঠিল অণিমা।

ধীরে ধীরে আমি উঠিলাম। চারিটি শব্দের মাঝে
জীবনের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে রহিল লিখিত।
প্রণাম করিয়া চলি অগ্নিশিখা নরেন্দ্র প্রতাপে,
হাত ধরি আগে আগে পথ চলে শ্রীমতী অণিমা।

মোজেইক-বনিয়াদে কাল-কশাঘাত গেছে মুছে,
কীটজীর্ণ আসনের "আশীর্ব্বাদ" জলজল করে।
আমি গোপীনাথ শুঁই, দীনহীন দেশের সেবক—
জলতলে ললিতার দীর্ঘশ্বাসে ফুটেছে কমল।

আশ্বিন, ১৩৪১

# হোলি

হারিয়ে গেল সোনার চাঁদ কালো মেঘের আড়ে
পূর্ণিমাতে পূব-আকাশে উঠল চাঁদ যেই ;
আবার এল হোলি-খেলার দিন ।
রাত না হতে আকাশ জুড়ে জমাট কালো মেঘ,
বইল ঝ'ড়ো হাওয়া ।
—মলয় বায়ু ভয়েই সারা, খাঁচার পাখী ডাকতে
গেল ভুলে—
কালো মেঘের পরদাখানি ফেলল ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
আগুন-গলা জলের মত ছেঁড়া-মেঘের ফাঁকে
পড়ল গ'লে চাঁদের চাপা হাসি ।
ঝ'ড়ো হাওয়া লাগিয়ে তালি ফাঁক বুজিয়ে যায়—
কালোয় কালো ফাগুন-পূর্ণিমা

সারাটা দিন আবির-খেলা খেলেছিলাম পথে,
ফাগের ছড়াছড়ি,
রাঙিয়ে দিয়ে ধূসর পথধূলি ।
কুমকুমেরি শায়ক ছুঁড়ে বিদ্ধ করেছিলাম
নগরপথে নাগরীদের ফুলের পারা গা ।

আড়নয়নে চেয়ে তারাই গোপন ইঙ্গিতে
জ্যোছনা-ফোটা ফুলবাগানে হয়তো ডেকেছিল ;
লোভে লোভেই চলেছিলাম, হঠাৎ আঁধিয়ারে
তলিয়ে গেল চাঁদের সুধা-হাসি।

হারিয়ে গেল পথ।
আকাশ পানে রইনু চেয়ে, চমকে দেখি, এ কি—
মেঘেরা সব ধরায় আসে নেমে!
যতই নামে ততই ওঠে বেড়ে
গুরু নিনাদ গম্ভীর গরজন।
হোলির দিনে নূতনতর খেলা!

মেঘ নয় তো মেঘের মত কালো পাখীর ঝাঁক
পক্ষ মেলি ধরায় আসে নেমে ;
শূন্য হতে বিরামহীন আগুনে-কুমকুম
ঝরতে থাকে শীতল ধরণীতে।
গর্জ্জে ওঠে শান্ত মাটি ; মলয় সমীরণ
তপ্ত হয়ে দিগ্বিদিকে ছড়ায় অবিরাম
বহ্নিকণা—সাপের ফণা শত
লকলকিয়ে উঠল যেন, ছোবল মেরে মেরে
নাগ-নাগিনী ক্লান্তি নাহি মানে।

হোলির রাতে ধূসর ধূলি কাগের রক্তে রাঙা,
রক্তরাঙা রঙের ঢেউ বইল পথে পথে—

দৃশ্য অপরূপ !
ফাগুন মাসে রুপালী জ্যোৎস্নার
মন-ভোলানো চাদরখানি লালেই হ'ল লাল ;
বুকের রক্তে ফাগের খেলা, নাই তুলনা, নূতন বৃন্দাবনে
আবার যেন অবাধ প্রেমে মিলল রাধাশ্যাম।

খেলেছিলাম যা এতদিন খেলাই সে তো নয় ,
দধি-কাদায়, আবিরে-কুম্‌কুমে
রইল লেখা এ ধরণীর পুতুল-খেলা-দিন।
শেষ হয়েছে সেই খেলা যে তাহার ইতিকথা
রইল লেখা পুরাণ-কাহিনীতে,
ভূর্জপাতা সাক্ষী হয়ে রয়।

এবার ইতিহাস
লোহে লেখা রক্ত-রসায়নে।
আপাততের মোহে
ভুলেই গেছি মরচে পড়ে লোহায়,
ভুলেই গেছি রক্ত মোছে মাটির ছোঁয়া লেগে,
লোহা-বিকার লোহ-বিকার মাটিতে হয় সার,
ফলে ফসল সবুজ সারবান।

হোলি-খেলার দেবতা, করি তোমায় নমস্কার।

১ ফাল্গুন, ১৩৪৮

# বিরহ

ঝঞ্ঝার দামামা শূন্যে, দিগ্বিদিক ধূসর শঙ্কায় ;
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু উঠিতেছে বিদ্যুৎ-হুঙ্কার,
আকাশ-অরণ্যে যেন ক্ষেপিয়াছে সহস্র কেশরী,
ফুলিতেছে উড়িতেছে নীল নভে পিঙ্গল কেশর।
নিম্নে শান্ত নদীনীরে শোনা যায় সমুদ্র-গর্জ্জন,
উত্তাল তরঙ্গলীলা পবনের করাঘাত-বেগে।

নিম্নে ঘন অরণ্য-নিবাসে
ভয়ে পাণ্ডু বনস্পতি-চূড়া ;
উচ্চশাখে কুলায় পাখীর
সঘনে দুলিছে মত্ত ঝঞ্ঝার তাড়নে।
ভয়ত্রস্ত পক্ষীমাতা পক্ষে ঢাকি শাবকের দল
বক্ষের উষ্ণতা দিয়ে তপ্ত করে ভীরু শীতলতা,
আপনি কাঁপিছে ভয়ে ভয়ঙ্কর ঝড়ের দাপটে ;
মুখে ইষ্টনাম জপি যাপিতেছে শঙ্কিত প্রহর।

পক্ষীপিতা গিয়াছে বাহিরে,
ক্ষুধার্ত শাবক কাঁদে, গিয়াছে আহার অন্বেষণে।
নীড়ের আশ্রয়ে রাখি সঙ্গিনীরে শাবকরক্ষণে
বাহিরিল বিহঙ্গম দুই পক্ষে করিয়া নির্ভর,
ভয়ঙ্কর এ দুর্যোগে একমাত্র দেবতা সহায়।

হেরিতেছি কল্পনায়, ফিরিছে প্রবাসী নাবিকেরা—
বিরহের কালাপানি পার হয়ে তাহারা ফিরিছে।
করেছে বাণিজ্যযাত্রা, হ'ল দীর্ঘদিন-
বহির্দ্বারে প্রেয়সীর ছলছল ম্লান মুখখানি,
গাঢ় ঘুমে সুখসুপ্ত অবোধ শিশুরা,
দোলায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশুকন্যা তার—
কণ্ঠে ফোটে নাই ভাষা—অস্ফুট কাকলি;
প্রবাসী ফিরিছে ঘরে, ভাবে মনে মনে,
শিশুরা হয়েছে বড়—পারিবে না হয়তো চিনিতে;
প্রাঙ্গণে পিতারে হেরি দ্বিধাভয়ে চাবে আড়চোখে,
আসিতে আসিতে কাছে ভয়ত্রস্ত ফিরিবে চকিতে।
দুদিনের পরিচয়, দুদিনের যামিনী-যাপন—
মিলন-রাগিণী বাজে বিরহের সানায়ের সুরে।
পুন দূর যাত্রা তার প্রিয়াহারা অন্ধকার পথে
—স্থূল প্রয়োজনের আহ্বান—
শিশুরা খেলে না খেলা, ওঠে না চপল কলতান।
লেন-দেন, মাপ-জোক, টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব,

তারি মাঝে গুপ্ত হায়, প্রিয় প্রিয়জনের জীবন—
বিরহের মাঝখানে মিলনের রাগিণী মধুর।

নাবিকের আছে আশা, আসা-যাওয়া এই তো জীবন ;
আকস্মিক মৃত্যু নাই দীর্ঘ হস্ত করিয়া প্রসার,
সংশয় যেটুকু শুধু মনের সংশয়।

আজ তো সংশয় নয়, মৃত্যু আছে লোলজিহ্বা মেলি।
প্রাণপাত্র ভঙ্গুর কাচের—
অবিশ্রাম ছোঁড়ে লোষ্ট্র এ তাণ্ডবে যমদূত যত,
যে কোনো নিমেষে প্রাণ ভগ্নপাত্র যাবে তেয়াগিয়া,
ফিরে যাওয়া হবে নাকো আর।
চিরবিরহের অন্ধকার
নিঃশেষে ঢাকিয়া দিবে ক্ষণিকের মধুর বিরহে ;
অনন্ত নিদ্রার ঘায়ে ছিঁড়ে যাবে স্বপ্ন-মায়াজাল।
তবু তারে যেতে হবে, বাহির হতেই হবে তারে।
দিশাহীন অন্ধকারে পথ যদি হারাইয়া যায়,
হয়তো হবে না বলা জীবনের পরম কথাটি—
চিরবিদায়ের বাণী ক্ষণ-বিরহের যাত্রাপথে
এ দুর্যোগ-ঝঞ্ঝা মাঝে চিরদিন রবে অকথিত।

এই তো বিরহ সত্য, মৃত্যুর পরশ এতে আছে—
হাসিমুখে চলে আসা—ফিরে গিয়ে পুন হাসিমুখে
বুকে যদি পারি নিতে—এ দুর্দিনে তাহাই বিস্ময়।

চ'লে আসি—মনে জানি এ বিদায় সুচির বিদায় ;
আমি জানি সেও জানে—ভয় বুকে রহে যে গোপন,
হাসিমুখে ব'লে আসি—ভয় ? ছি ছি, ভয় পাও তুমি !
সেও হাসে, হাসে হাসি ম্লান—
আমি জানি সে হাসির দাম ;
কণ্ঠরোধ-করা অশ্রু জ'মে গিয়ে হাসি হয় চোখে।
বলে, থেকো সাবধানে অতি—
বলে না ভয়ের কথা—সর্বক্ষণ শিহরায় ভয়ে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে মৃত্যু অবিরাম ক্রূর হাসি হাসে—
চোখে চোখে জাগে সেই ছবি।

কখনো দেখি নি আগে বিচিত্র এ বিরহের রূপ,
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে দেখি নি।
মধ্যযুগে দেখিয়াছি শুধু ইতিহাসের পাতায়—
যুদ্ধে যেত বীরদল, জয়মাল্য পরায়ে গলায়
প্রেয়সী বিদায় দিত, বিরহের অশ্রুর পাথারে
ভেসে যেত তরী সম—দূর দূর দূরতর ক্রমে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজিত তোরণে,
বুক বেঁধে ঝাঁপ দিত নববধূ বিরহ-সাগরে।

বিরহ-বিলাস খুঁজে আজ যেতে হয় না বাহিরে,
মৃত্যু আসে—ঘরে শুয়ে, আপনার পরিচিত ঘরে
প্রেয়সীর হাতে-রচা দৈনন্দিন আরাম-শয্যায়,
উর্দ্ধ হতে অকস্মাৎ নিম্নমুখে ছুটে আসে বাণ,

বেদনা-বিক্ষেপ নাই—সে সময় হয় না কাহারো।
প্রিয় ও প্রিয়ার মাঝে নেমে আসে গাঢ় ব্যবধান,
নেমে আসে রাত্রির আঁধার,
নেমে আসে বন্যাস্রোতে বিরহের সমুদ্র বিপুল।

বিরহের রাজপাটে আমরা বসিয়া আছি সবে,
হাসি খেলি গান গাই বিরহীরা সকলে মিলিয়া;
তলে তলে বিরহের ক্ষীণ সুর ফল্গুধারা সম
কুলুকুলু কলকল মনে মনে অবিশ্রাম বহে।
কেন, কেন, কেন—প্রশ্ন শুধু
গভীর অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে হয় যে বাহির।
কার কাছে জানাব নালিশ?
তোমার আমার মত সকলেই জানি অসহায়,
নিয়তির পাপচক্রে বিশ্বব্যাপী বিরহ-পাথার
করিতেছে থৈথৈ অসহায় মানুষেরে ঘিরি।
কেহ কিছু নাহি জানে, কেন কেন—কে দিবে উত্তর!

৬ বৈশাখ, ১৩৪৯

# নচিকেতা

নচিকেতা, তব সন্ধান হ'ল শেষ ?
মৃত্যু-আলয়ে আতিথ্য লভি ফিরিলে মর্ত্যভূমে ,
প্রশ্নে প্রশ্নে যমে জর্জর করি
মনোমত বর লভিয়া হে ঋষি, তমসা হইয়া পার
আসিলে ফিরিয়া সাধের এ মরলোকে ।
মিলেছে কি সমাচার ?
কঠোর কঠোপনিষদে তোমার কাহিনী কি কহে কথা,
মৃত্যু-লোকের খবর কি আছে তায় ?
হায় নচিকেতা, বিফল যাত্রা তব ।

নচিকেতা, তব সাধনা কঠোর কি দিল আমারে আনি ?
একটি কাহিনী—উপলখণ্ড কালবারিধির তটে,
যজ্ঞ-অগ্নি তাহারই একটি নাম ।
হায় নচিকেতা, মর্ত্যলোকের জীবন মরণশীল,
ধরায় বিরহ-ব্যথায় কাতর শঙ্কিত ভীরু প্রাণ

তোমার কাহিনী মাঝারে তাহারা পেয়েছে কি আশ্বাস,
সম্মুখ হতে উঠেছে কি কারো প্রাণমৃত্যুর রহস্য-যবনিকা,
দৃষ্টি হইতে ছিঁড়িয়া খসেছে কারো সংশয়-জাল ?
হায় নচিকেতা, বিফল সাধনা তব।

নচিকেতা, মোরা যুগ-যুগান্ত বসিয়া রয়েছি
নীল বারিধির কূলে,
পাই না দেখিতে কি আছে সলিল-তলে।
শুধু গর্জ্জন শুনিতেছি কানে অনন্ত কাল ধরি,
দেখিতেছি চোখে ফেনাময় চপলতা।
বালুতটে শুধু তরঙ্গলীলা আছাড়ি আছাড়ি পড়ে—
আছাড়িয়া পড়ে, রাখে না চিহ্ন কোনো ;
তটে তরঙ্গে এই পরিচয় শত কোটি বর্ষের—
তট তরঙ্গ তবু পরিচয়হীন।

নচিকেতা, মোরা বালুতটে বসি রয়েছি চাহিয়া
সলিল-সমাধি-তলে,
রয়েছি চাহিয়া যুগ-যুগান্ত ধরি—
মণি-বিখচিত প্রবাল-ভূষণ তুমি একবার
এনেছিলে ডুব দিয়ে,
তাহারই কাহিনী শুনিতেছি প্রতিদিন,
শুনি রূপকথা নচিকেতা-মৃত্যুর।
শুনি আর দেখি, একটি একটি ক'রে
তটের বালুকা খসিয়া খসিয়া পড়ে,

কাল-তরঙ্গে একে একে সবে ডুবিছে মর্ত্যপ্রাণী।
পিছনে যাহারা প্রতীক্ষা করে বালুতট-আশ্রয়ে,
তারা দেখে বিস্ময়ে—
যারা যায় তারা ফিরিয়া আজিও আসিল না হায় কেউ,
ডুবিল যাহারা উঠিল না তারা কেউ।

নচিকেতা, তব প্রাচীন কাহিনী মানি যে অর্থহীন,
মৃত্যুর কালো, আলো তার মাঝে পশিবে না
কোনো দিনও,
নচিকেতা, ছাড়ো পুরাতন প্রতারণা।

আশ্বিন, ১৩৩৮



## সজনীকান্ত দাসের অন্যান্য পুস্তক

| | | |
|---|---|---|
| কাব্য | পঁচিশে বৈশাখ | ১৷০ |
| | রাজহংস | ৩্ |
| | আলো-আঁধারি | ১৷০ |
| ব্যঙ্গ কাব্য | কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল | ২৷০ |
| | অঙ্গুষ্ঠ | ১৷০ |
| | মনোদর্পণ | ১্ |
| উপন্যাস | অজয় | ২্ |
| ব্যঙ্গ গল্প | কলিকাল | ১্ |
| | মধু ও হুল | ১৷০ |